সনাতনী।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রণীত।

শ্রীকেদারনাথ বসু বি. এ.
২৮।৪ অখিল মিস্ত্রির লেন—কলিকাতা।
১৯১১।

পূর্ব্ব পীঠিকা।

আজ কাল অনেক 'শিক্ষিত' লোকেই পরিবর্ত্তন-প্রয়াসী,—মনে করেন, ধর্ম্মে সমাজে, শিক্ষায় দীক্ষায়—সকল বিষয়েই নিয়ত পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয়। সংসারের গতিই যেন কেবল পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিতেছে; পরিবর্ত্তন দ্বারাই সংসারের সকল পদার্থেরই যেন পরিস্ফুটন হইতেছে। এটি তাঁহাদের বিশ্বাস, কিন্তু এটি একটি বিষম ভ্রমাত্মিকা ধারণা। যেমন পেষণী-চক্রে, একটি অপরিবর্ত্তনীয় কীলক কেন্দ্রে রাখিয়া পাথর ঘুরিতে থাকে, সেইরূপ কি সমাজে, কি ধর্ম্মে, কেন্দ্র পদার্থ স্থির থাকে,—সেইটিকে বেষ্টন করিয়া, রক্ষা করিয়া, নানা পদার্থ ঘুরিতে থাকে। কিন্তু বিবাহ যে আট প্রকার ছিল? ছিল বৈকি। কিন্তু একটা কথা স্থির ছিল,—নারী যে ভাবেই পুরুষকে পাইয়া থাকুক, তাহাকে লইয়াই তাহার যাবজ্জীবন কাটাইতে হইবে। পুরুষ হয়ত তাহাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া আনিয়াছে,—হয়ত তাহার জ্ঞান লুপ্ত করিয়া নিতান্ত কদর্য্য ভাবে তাহাকে আপন করগত করিয়াছে—যে ভাবেই পুরুষ নারীকে আনয়ন করুক, উভয়ে একবার সংমিলন হইলে, সে নারী আর পুরুষান্তর গ্রহণ করিতে পারিবে না। মনু হইতে এখন পর্য্যন্ত বিবাহের অনেক ছালের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু ভিতরের ঐ যে সার কথা—তাহা একই ভাবে আছে। যদি কেহ বিবাহের কোনরূপ পরিবর্ত্তন করিতে চাও, ঐ ছালের খোসার পরিবর্ত্তন কর, ভিতরের সারে বা আঁটিতে হস্তার্পণ করিও না। যে গুলি সার কথা, মজ্জার কথা, অপরিবর্ত্তনীয়া, সেই গুলিকেই **সনাতনী** বলিয়াছি।

জগতের সকল জাতির মধ্যে হিন্দু ও য়ূদীকে দেখিলে এই সনাতনীর একটু একটু আভাস পাওয়া যায়। খণ্ড ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন নাই। ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন নাই বলিয়াই, ভাল-মন্দ বিচার কালে, ধর্ম্মকে সাক্ষী স্বরূপ বা কষ্টিপাথর স্বরূপ মনে করিতে হয়। আর সকল পদার্থেরই পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, সুতরাং বিচার কালে, আর কোন পদার্থকেই কষ্টিপাথর মনে করা ভ্রম। এইরূপে বিবেক বা চিত্ত-গুরু কষ্টিপাথর হইতে পারে না। কেননা কামস্কাট্‌কা-বাসীর বিবেকের সহিত আমার বিবেকের মিল নাই। ধর্ম্মের এই অপূর্ব্ব শক্তি **সনাতনী** বলিয়া আমাদের সনাতন সমাজের উহাই একমাত্র আধার এবং অবলম্বন। সমাজকে ধারণ করিয়া আছে বলিয়াই ধর্ম্মের ধর্ম্মত্ব। আত্মরক্ষার জন্য, সমাজ-রক্ষার জন্য এই ধর্ম্মের যাজনা করা সকলেরই সাধ্যমত কর্ত্তব্য। আজ যতটুকু যাজনা করিতে পারি, কাল যেন তাহার অপেক্ষা বেশী পারি, সেইরূপ চেষ্টা করা সকলেরই উচিত। ধর্ম্মের অনুষ্ঠাতার প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি লইয়া, ক্ষমতা-অক্ষমতা ভাবিয়া ধর্ম্মের যাজনা করিতে হইবে না; ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনীয় নহে, কিন্তু ধর্ম্ম-সাধনের উপায় ও উপকরণ পরিবর্ত্তনীয় বটে। ধর্ম্ম স্থির, তাহাতে লক্ষ্য রাখিয়া ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে; শত সহস্র নারী কর্ম্মদোষে বা শিক্ষাদোষে অসতী-পন্থা-চারিণী হইলেও, সতীভাবের লেশমাত্র ব্যতিক্রম করিতে হইবে না। বলিতে পারেন, আরও ত অনেক দেশ রহিয়াছে, সে সকল দেশের ধর্ম্মভাবের দিন দিন পরিবর্ত্তন হইতেছে, অথচ সে সকল দেশের উন্নতিও হইতেছে, আমাদের দেশেই এরূপ হইবে কেন? ইহার উত্তর,—অন্যান্য দেশ ভোগভূমি, কেবল ভারতবর্ষই কর্ম্মভূমি। দানের দ্বারা ভোগের সার্থকতা করিতে যদি আমরা অভ্যাস করি, তাহা হইলে ভোগের সাধনে ধর্ম্মের সাধন হয়। কর্ম্মের বা ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন

হইতেই পারে না। বিশেষ সত্য-অহিংসাদি নিত্য ধর্ম্ম; এ গুলির পরিবর্ত্তন কথনই হয় না। ব্রতনিয়মের পরিবর্ত্তন হয়, হউক—নিত্য ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন নাই।

জাতি—জন্ম হইতে যে জিনিষটা আমরা পাই; সেটা একরূপ অপরিবর্ত্তনীয়। যেরূপ তপস্যায় জাতির কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইত, এখনকার দিনে তাহা একরূপ অসম্ভব। সুতরাং জাতির পরিবর্ত্তন হইতেছে,—কিন্তু কেবল নিম্ন দিকেই। এক জীবনে উন্নতি অসম্ভব। জাতি রক্ষা করাই দায়, উন্নতি ত দূরের কথা। ব্রহ্ম-ধারণায় সমাজের উপর ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব ছিল, ব্রাহ্মণ অনেক স্থলেই সে ব্রহ্ম-ধারণা হইতে বঞ্চিত, কাজেই সমাজ হইতে ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব দিন দিন কমিতেছে। পুরুষকার দ্বারা এই সকল বিড়ম্বনা হইতে পরিত্রাণের উপায় করিতে হইবে,—কেননা পৌরষ দ্বারাই কার্য্যসিদ্ধির চেষ্টা করিতে হয়।

নারীর সতীত্ব-শক্তি বা পাতিব্রত্য সনাতনী। ঐটি অব্যাহত রাখিয়া নারীজাতীর উন্নতি করিতে হইবে। কেন্দ্র-ভ্রষ্ট হইলে সমস্তই নষ্ট হইবে। শিক্ষায় শিখাইতে হইবে, জড়-জগতে অপূর্ব্ব শৃঙ্খলা;—সেই শৃঙ্খলা হইতে ভাব-জগতের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য এবং আধ্যাত্মিক জগতের পরম-মাঙ্গল্য। বুঝাইতে হইবে,—বৈষম্যে-সাম্য কি রূপ? বুঝাইতে হইবে,—জীবন- সংগ্রাম নহে, জীবন—স্বস্তি এবং শান্তি। সুখ-দুঃখের কথা—উপরের ত্বকের কথা,—সেবা পরম ধর্ম্ম, অপরিবর্ত্তনীয় কেন্দ্র। এই কেন্দ্র-জ্ঞান থাকিলে বুঝা যায় যে, সেবার সুবিধার জন্যই সুখ-দুঃখের তারতম্য এবং অবস্থিতি।

গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ। গার্হস্থ্য ধর্ম্মের মূলে বিবাহ-ব্যবস্থা, মনুর ব্যবস্থা অতি পুরাতনী হইলেও সনাতনী; আর আমাদের যতই দুর্দ্দশা হউক, মনুর বিধান এখনও আমরা সহজে পালন করিতে পারি।

।

গার্হস্থ্য ধর্ম্মের আর তিনটি প্রধান কথা, গৃহস্থকে—অঋণী থাকিয়া কার্য্য করিতে হইবে। প্রবাস—কিছু কালের জন্য হইতে পারে, কিন্তু বাসের স্থিরতা থাকা আবশ্যক; সেখানে দেবতা-ব্রাহ্মণ-অতিথির নিয়ত যথাসাধ্য সেবা হইবে। গৃহস্থ অঋণী, অপ্রবাসী হইয়া নিজ গৃহে সামান্যে সন্তুষ্ট থাকিবেন।

দীক্ষার কথা, ব্যক্তিগতা কথা,—আমরা **সনাতনী**র মূল গ্রন্থ মধ্যে (না দিয়া "নবজীবন" হইতে উদ্ধৃত করিয়া) পরিশিষ্টে প্রদান করিলাম।

এইরূপে, এই ভাবে **সনাতনী** প্রকাশিত হইল। আমি মূর্খ; **সনাতনী** প্রকাশ করিয়া পাণ্ডিত্যের দাবি করিতেছি, প্রার্থনা করি—এমন দারুণ নির্ব্বুদ্ধিতা আমার উপর কেহ যেন আরোপ করেন না। তবে, আমি যত কেন অকিঞ্চন হইনা, আমি নিজের কথা অতি অল্পই বলিয়াছি; কিন্তু কথাগুলা পুরাতনী, হয় ত বা সনাতনী।—এই সময়ে, এই সকল কথার একটু আধটু আলোচনা হইলে ভাল হয়,—এমনই একটা ধারণা আমার হইয়াছে। আলোচনা হইবে না কি? অবশ্য হইবে।

১লা মাঘ, ১৩১৭।

গ্রন্থকার।

উৎসর্গ।

পরম কল্যাণীয়,

শ্রীমান্ অজরচন্দ্র সরকার ও শ্রীমান্ অচ্যুতচন্দ্র সরকার

অশেষ মঙ্গলাস্পদেষু,—

অজর! অচ্যুত!

পিতৃদেবের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিয়া তোমাদের দুই জনকে **সনাতনী** উৎসর্গ করিলাম। কেবল যে পূর্ব্ব প্রথায় আমার অনুরাগ-বশে, এমন নহে, প্রত্যুত ইহাতে আমার যৎকিঞ্চিৎ ভবিষ্যতের আশাও আছে। **সনাতনীর** ৬০।৬১ পৃষ্ঠায় তাহার আভাস দিয়াছি। এই খানে সেই কয় পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া সেই আশা প্রকটীকৃত করিলাম।

"আমরা আপনারা যমানুষ্ঠানের চেষ্টা করিব। আমাদের সন্তান-সন্ততিগণ যাহাতে ঐরূপ অনুষ্ঠানে রত হন, পোষ্যবর্গের মধ্যে অনুগত ব্যক্তিরা যাহাতে ঐরূপ করেন এবং যদি আমাদের প্রকৃত শিষ্য-সেবক কেহ থাকেন, তবে তাঁহারাও যাহাতে অহিংসাদি ধর্ম্ম পালন করেন, সে বিষয়েও কায়মনোবাক্যে, দৃষ্টান্ত উপদেশাদি দ্বারা চেষ্টা করিব। যদি মরণকালে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, আমি নিয়ত যমানুষ্ঠানের চেষ্টা করিয়াছি, অনেক সময় কৃতকার্য্য হইয়াছি, আর পাঁচটি যুবা পুরুষকে সেইরূপ অনুষ্ঠানে রত রাখিয়া চলিলাম—তবে কি সুখের মৃত্যুই না হইবে।"

নিয়ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

সূচীপত্র।

সনাতনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সনাতন ধর্ম্ম।

হিন্দু ও য়ূদী।

এখনকার দিনে স্বধর্ম্ম যেন কিছু ম্রিয়মাণ মত বোধ হইতেছে; এভাব থাকিবে না, অচিরে স্বধর্ম্ম আবার জীবন্ত ভাবেই পরিদৃশ্যমান হইবে। পূর্ব্বপক্ষের প্রশ্ন—যাবতীয় জীবন্ত পদার্থেরই কৈশোর, যৌবন, বার্দ্ধক্য, জরা, মরণ আছে, কেবল সনাতন ধর্ম্মেরই কি সেরূপ পরিণাম হইবে না? পুরাতন বলিয়াই কি মরিবে না? না, শীঘ্র মরিবে? এই প্রশ্ন ভাবিবার বিষয় বটে। অনেক দিন ভাবিয়াছি ও ভাবিতেছি। প্রায় পঁচিশ বৎসর হইল, পিতৃদেব ঐ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার পর শত্রু মিত্র অনেকেই ঐ কথা তুলিয়াছেন, আমিও আপন মনে ঐ কথা তোলাপাড়া করিয়াছি, তাহারই ফল লিপিবদ্ধ করিতেছি।

সকল গাছই ত বুড়ো হইয়া মরিয়া যায়, কিন্তু বটবৃক্ষ ত মরে না। বটগাছ যৌবনে পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই জটা

ফেলিতে থাকে। জটাগুলি সমস্তই অভিনব মূল। দেখিবে, প্রাচীন মূল জীর্ণ হইয়া, কীটদষ্ট হইয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু চারিদিকে, অন্য চারিটি মূল, এমন দৃঢ়ভাবে মাটিতে বসিয়াছে, যে তাহাতে বৃক্ষরাজ, "গট হয়ে বসে যেন গাছের পাহাড়।" ভীষণ ভূকম্পে টলে, কিন্তু চলে না, প্রলয়কারী ঝঞ্ঝা প্রভঞ্জন দশটা আশে পাশের শাখা ভাঙ্গিয়া নিজ নামের গৌরব রক্ষা করেন, কিন্তু মূল গাছ অনড়, অটল।

পুরাণে, ইতিহাসে এইরূপ অনেক অক্ষয় বটবৃক্ষের বিবরণ আছে। রাঢ় হইতে পুরীযাত্রার প্রাচীন পথে এইরূপ একটি মহাবট ছিল, এখনও নাকি আছে। নর্ম্মদা নদীতীরেও নাকি এইরূপ বট মুসলমান সময়ে ছিল, তাহার তলদেশে এক সময় পাতশাহের বিপুলা বাহিনী আশ্রয় লাভ করিয়া বিষম ঝঞ্ঝাবাতে রক্ষা পাইয়াছিল। বালককালে, নদীয়া জেলার উলাগ্রামে, ৺ উলাইচণ্ডীতলায়, এইরূপ মহাবট দেখিয়াছিলাম, কোনটি তাহার মূল, আর কোনগুলি শাখা তাহা কিছুতেই বুঝা যায় না। মধুপুর ও বৈদ্যনাথের প্রায় মাঝামাঝি বহরন্ গ্রামে একটি বৃহৎ বটবৃক্ষ আছে, সরকার হইতে তাহার তলদেশ মাপ করান হইয়াছিল; প্রায় দশ-বিঘা হইবে। তাহার কোন্‌খানে যে মূল ছিল, তাহাও বুঝা যায় না, যেন মাটিতে মূল প্রোথিত আছে, এবং বিশ পঁচিশটা বৃহৎ বৃহৎ শাখা উপরে জাগিয়া রহিয়াছে। এইরূপ আরও অনেক স্থানে আছে। যে জট গাড়িতে জানে, তাহার মূল কখন যায় না—সদাই নূতন মূল

হইতেছে। যেরূপ বটবৃক্ষে সেইরূপ বংশপরম্পরায়। মার্ক-ণ্ডেয়ের পরমায়ু পাইলেও মনুষ্য মরে; দীর্ঘজীবী হইতে পারে, কিন্তু মরিয়া যায়; কিন্তু বংশরক্ষা করিতে জানিলে, বংশ কখন মরে না। অতি প্রাচীন ঋষিগোত্রের লোকসকল এখনও বর্ত্তমান। তাঁহাদের আচরিত সনাতন ধর্ম্মই বা একেবারে নষ্ট হইবে কেন? এই যে মহাবাক্য 'যখনই ধর্ম্মের গ্লানি হয়, তখনই ধর্ম্ম পুনঃস্থাপন জন্য ভগবান আবির্ভূত হন' এটি যদিই বা ভগ-বানের শ্রীমুখের বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে না পারি, তথাপি এরূপ হওয়া কি একান্ত অসম্ভব? ভারতের ইতিহাস, না হয়, কিছুই নাই বলিয়া উড়াইয়া দিলাম, কিন্তু সমগ্র জগতের ইতি-হাস কি ঐ অপূর্ব্ব কথা প্রমাণিত করিতেছে না? এই দেখিয়াই বুনসেনের অপূর্ব্ব গ্রন্থ 'ইতিহাসে ঈশ্বরের সত্তা' God in History; এই দেখিয়াই ত হর্ব্বট স্পেন্সর জগতের গতি ছন্দানুবর্ত্তিনী বলিয়াছেন; পতনের পর উত্থান, আবার উত্থানের পর পতন, ইহাকেই ত তিনি Rhythm বা ছন্দ বলিয়াছেন।

আবার পূর্ব্বপক্ষের প্রশ্ন—আসুরীয়েরা (Assyrians), শকেরা (Scythians), যবনেরা (Ionians) এবং রোমকেরা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল কেন? সনাতন ধর্ম্মবাদীদিগেরও সেইরূপ দশা যে হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? একটু প্রণিধান করিয়া ভাবিলেই উত্তর পাওয়া যায়। ধর্ম্ম ধার্ম্মিককে রক্ষা করেন। হিন্দু এবং য়ূদী বহু নির্য্যাতনেও কেবল ধর্ম্মবলে

এখনও জীবিত আছেন। ধরিয়া লইলাম, আপনার অগৌরব করাই পরম পুরুষার্থ। সুতরাং হিন্দুর কথা এখানে নাই বলিলাম, কিন্তু একবার য়ূদীর প্রতি দৃষ্টিপাত কর দেখি! য়ূদী কোন্‌কালে বাস্তুদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে, তাহার উপর, কত উৎপীড়ন উপদ্রব মাথায় বহিয়াছে, এখনও বহিতেছে, তবু মরে নাই; কেবল মরে নাই নহে, জগতের মধ্যে সুন্দর, সুশ্রী, উন্নতদেহ, দীর্ঘজীবী, বলিষ্ঠ, প্রফুল্ল, ধনশালী, কলা-নিপুণ জাতি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কেন? তাহারা স্বধর্ম্ম-পরায়ণ এবং সদাচারনিষ্ঠ বলিয়া। চৌরঙ্গীর এজ্রা, গব্বয়দিগকে দেখিবার প্রয়োজন নাই, একবার ক্যানিংষ্ট্রীটের মুর্গীহাটার সামান্য পণ্যজীবী য়ূদীগণকে দেখিয়া আইস—দেখিবে অশীতিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ কেমন তৎপরতার সহিত কার্য্যকুশলতা দেখাইতেছে—ইহাদের দেখিয়া, তাহার পর য়ূদীনির্য্যাতনের ইতিহাস স্মরণ কর, তাহার পর এই জাতি কর্ত্তৃক সদাচার ও স্বধর্ম্ম পালনের কথা পাঠ কর,—নিশ্চয়ই বুঝিবে, ধর্ম্মই সমাজকে ধারণ করিয়া থাকে, ধর্ম্মই ধার্ম্মিককে রক্ষা করে।

কিন্তু এখনকার দিনে, ধর্ম্ম জিনিষটা যে কি, তাহা বুঝা বড় কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। কঠিন হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই, অথচ ধর্ম্ম বাদ দিয়া অন্য উপায় নাই বলিয়াই, আমাদের ক্ষীণা শক্তিতে ধর্ম্মের ভাব বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্ম ও খণ্ডধর্ম্ম।

উভয়ের প্রয়োজন।

পরোপকারই ধর্ম্মের এক মাত্র সাধন, অপকারই ধর্ম্মের একমাত্র অন্তরায়। যিনি উপকারী তিনিই ধার্ম্মিক, যিনি অপকারী তিনিই অধার্ম্মিক। আর উপকারেই সুখ, এবং অপকারেই সুখের হ্রাস। সুতরাং ধর্ম্মের সহিত এই জগদ্বাসীর সুখদুঃখের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। সকলেরই আছে। ধর্ম্ম, আচার্য্য বা উপাচার্য্য, গুরু বা পুরোহিতের নিজস্ব নহে, ধর্ম্ম আমাদের সকলেরই। কিন্তু আজকাল এমনই কাল পড়িয়াছে যে, তুমি আমি ধর্ম্মের কোন কথায় প্রায়ই থাকিতে চাহি না, কেন না উহাতে বড় গোল, বড় বিসম্বাদ, বড় কলহ হয়।—এ সকল নিতান্ত অসার কথা। প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্বে কিছুমাত্র গোলযোগ নাই, বিসম্বাদ নাই।

স্বীয় বাটীর নিত্যসেবার ভার যেরূপ বৃদ্ধা পরিচারিকা ও পুরোহিতের প্রতিনিধির উপর অর্পণ করিয়াছেন, সেইরূপ এই ধর্ম্মের ভার, তত্ত্ববোধিনী বা ধর্ম্মতত্ত্ব অথবা রবিবারের মিরারের প্রতি অর্পণ করিয়া, নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না।

ধর্ম্মই সমাজের বন্ধন। পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিব এইরূপ বিশ্বাসে, যে অতি বিস্তীর্ণ কারবার চলিতে থাকে, তাহার নাম সমাজ। পরস্পরের সাহায্যও যাহাকে বলে, পরস্পরের উপকারও তাহাকেই বলে, সুতরাং পরস্পরের উপকারেচ্ছু সম্প্রদায়ের নাম সমাজ। আর পূর্ব্বেই বলিয়াছি উপকারই ধর্ম্মের সাধন; তাহাতেই বলি একমাত্র ধর্ম্মই সমাজের বন্ধন। এ হেন ধর্ম্মকে অবহেলা করিলে চলিবে না। যদি বাস্তবিক দেশের উপকার করিতে ইচ্ছা থাকে, তবে ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ কর।

অনেকে উত্তর করিতে পারেন, যথার্থ ধর্ম্মে অর্থাৎ পরোপকারে কাহারও বিতৃষ্ণা নাই। মনুষ্য মাত্রেই উপচিকীর্ষু; তবে বুদ্ধির ভ্রমবশত রামের উপকার করিতে গিয়া শ্যামের মন্দ করিয়া বসে। মনুষ্যের বিবেচনাশক্তির পরিপুষ্টি হইলেই, মনুষ্য একের উপকারের সহিত অন্যের উপকারের তুলনা করিতে পারিবে। যখন দেখিবে যে, কোন কার্য্যে এক জনের লাভ অপেক্ষা অপরের ক্ষতি অধিক হইতেছে, তখন আর সে সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে না। স্ত্রীর অলঙ্কারের জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না, পুত্রকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য উৎকোচ গ্রহণ করিয়া একজনের সর্ব্বনাশ করিবে না। যে যত ভাল বিবেচনা করিতে পারিবে, সে ততই ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে। এরূপ জ্ঞানধর্ম্মে তাঁহাদের কাহারও বিদ্বেষ নাই; আরও বলিতে পারেন যে, এ ধর্ম্মের সহিত তিলক ত্রিকণ্ঠীর, দাড়ী চসমার,

কি সম্বন্ধ আছে ? তাঁহারা ধর্ম্মবিদ্বেষী নহেন, কিন্তু উপধর্ম্মে তাঁহাদের সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা আছে।

এই দুই কথার সহিত আমাদের মতের ঐক্য নাই। ধর্ম্ম এবং খণ্ডধর্ম্ম ইহার একটিকেও আমরা ত্যাগ করিতে পারি না। প্রথম কথা, বুদ্ধিকে আমরা একা কর্ত্রী করিতে প্রস্তুত নহি। কেননা বুদ্ধির শাসন নাই, ধর্ম্মের শাসন আছে। অধর্ম্মে অসুখ, একথা ঘোর অধার্ম্মিককেও স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু নির্ব্বুদ্ধিতার ফল, কখন নির্ব্বোধে স্বীকার করে না। বুদ্ধি ভাল মন্দ বুঝাইয়া দেয় বটে, কিন্তু মন্দ ছাড়িয়া ভালটি অনুসরণ করিতে হইবে, এ উপদেশ কেবল ধর্ম্মই প্রদান করিতে পারেন। সুতরাং আমরা ধর্ম্মকে ত্যাগ করিতে পারি না। ধর্ম্মের মাহাত্ম্য স্থাপনার্থ আর অধিক কথা বলিবার আবশ্যক নাই। তবে ধর্ম্মযাজনও যে নিতান্ত আবশ্যক, ইহা দেখানই আমাদের উদ্দেশ্য।

ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মখণ্ড মানবসমাজে উভয়েরই সমান প্রয়োজন। হিন্দুয়ানী, খ্রীস্টানী, মুসলমানী, এই সকলকে খণ্ডধর্ম্ম বলি। যেরূপ উপকারসাধনধর্ম্ম না থাকিলে মনুষ্যত্ব থাকে না; সেইরূপ বিভেদমূলক খণ্ডধর্ম্ম না থাকিলে জাতিত্ব থাকে না। এবং জাতিত্বই সমাজের মূল।

স্বার্থ এবং পরার্থের মধ্যগত ভাবের নাম খণ্ডধর্ম্ম। মানবহৃদয়ে দুইদিক হইতে দুইটি স্রোত চলিতেছে। একটি অপরটির বিপরীতাভিমুখগামী। একটির নাম স্বার্থ অপরটির নাম

পরার্থ বা ধর্ম্ম। স্বার্থের অপর নাম 'অহংকার,' পরার্থের অপর নাম 'উপকার'। অহংকার আপনার জন্যই বিব্রত, উপকার আপনার দিকে একবার পলকপাতও করেন না। 'স্বার্থ' কিসে কিঞ্চিৎ 'ভাল' হইবে, তাই লইয়া ব্যস্ত, এবং পাছে কিছু ক্ষতি হইবে সেই ভয়েই সশঙ্কিত। ধর্ম্ম আত্মপ্রসাদেই চরিতার্থ এবং কেবল আত্মগ্লানিতে ভীত। প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার আডাম স্মিথ মানবহৃদয়ের এই দুই বিভিন্ন ভাবের ফল পৃথকরূপে প্রদর্শিত করিয়াছেন। তৎকৃত অর্থব্যবহার (Wealth of Nations) গ্রন্থ পাঠ করিলে বোধ হয় যে, ইহ সংসারের মধ্যে লাভালাভই মূল কথা। দয়া, ধর্ম্ম, ভক্তি, শ্রদ্ধা প্রভৃতি প্রবৃত্তিনিচয় নাটক বা উপন্যাসের কথা মাত্র। আবার তৎকৃত 'ধর্ম্মভাব' (Moral Sentiments) গ্রন্থে, মানবহৃদয়ের দেবভাবগুলি সেইরূপ জাজ্বলীকৃত রহিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক মানব, একাদিক্রমে কখন বিশুদ্ধ দেবভাবে বা নিরবচ্ছিন্ন পশুভাব ভরে সংসারে জীবনক্ষেপ করেন না। দেবত্বে এবং পশুত্বে, মনুষ্যত্ব। মনুষ্য কখন কেবল আপনাকে লইয়াই ব্যস্ত, আবার কখন আপনাকে ভুলিয়া পরের জন্য উন্মত্ত।

ধর্ম্মের ক্রিয়া সম্প্রসারণ; স্বার্থের ক্রিয়া আকুঞ্চন। যে মনুষ্যে স্বার্থ অত্যন্ত প্রবল, সে ক্রমে কুঞ্চিত, অতি কুঞ্চিত, অত্যতি কুঞ্চিত হইয়া নিতান্ত ক্ষুদ্রমনা হইয়া পড়ে। শিক্ষার এবং ভূয়োদর্শনের অভাবই এই ক্রমশ স্বার্থ-প্রবণতার হেতু। কতকগুলি লোক দিনের দিন এই অত্যতি কুঞ্চিত ভাব প্রাপ্ত

হইতেছেন; এমনই স্বার্থপর হইতেছেন,—যে, আজি কালি তাঁহারা আর তাঁহাদের আপনাদের অতিধন পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার জন্যও যৎকিঞ্চিৎ যত্ন করিতে ইচ্ছুক নহেন। আত্মসেবায় তাঁহাদের চিত্তপ্রবৃত্তি পর্য্যাপ্ত থাকে। তাঁহারা ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র। তাঁহাদের হৃদয় পরমাণু।

পক্ষান্তরে আবার ধর্ম্মের ক্রিয়া সম্প্রসারণ। যে হৃদয়ে ধর্ম্ম অত্যন্ত প্রবল সে হৃদয় আর সমাজবন্ধন মানে না, জাতিভেদ মানে না। এরূপ ধর্ম্ম-প্রবণ মানব সংসারত্যাগী। তাঁহার পক্ষে হিন্দু মুসলমান নাই, স্নেহ নাই, প্রীতি নাই, বাৎসল্য নাই, শ্রদ্ধা নাই, প্রণয় নাই,—কেবল আছে এক উপকার। এরূপ মানব সংসারে অতি বিরল। ইঁহাদের হৃদয় অত্যতি সম্প্রসারিত; এরূপ সম্প্রসারিত যে, সে হৃদয়ের গভীরতা একেবারে নাই বলিলেও চলে। অত্যন্ত ধর্ম্মপ্রবণতাও কিছু নহে, অত্যন্ত স্বার্থ-প্রবণতাও কিছু নহে। ঘোর স্বার্থানুসন্ধায়ী হইতে যেরূপ সমাজের কোন উপকার নাই, সেইরূপ কঠোর ত্যাগী হইতে সমাজের বা দেশের কোনই উপকার নাই। সুতরাং ধর্ম্ম এবং স্বার্থের সমঞ্জসীকরণ সমাজরক্ষাপক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। ধর্ম্মের প্রসারণক্রিয়া এবং স্বার্থের আকুঞ্চনক্রিয়া, এতদুভয়ের মধ্যে যাহাতে সমমান (Equilibrium) রক্ষা হয়, সমাজরক্ষার্থ এরূপ করা নিতান্ত আবশ্যক; নহিলে ধর্ম্মের গুণে হয়ত ক্রমেই বাড়িতে বাড়িতে বাড়িতে থাকে, আর না হয়ত স্বার্থবলে ক্রমেই কমিতে কমিতে

কমিতে থাকে। ঐ উভয় শক্তি যদ্দারা সমান বল সঞ্চয় করিয়া, উভয়ে মিলিয়া স্থিতিস্থাপকতা লাভ করে, সমাজরক্ষার্থ তাহা নিতান্ত আবশ্যক। অতএব সমাজরক্ষার্থ খণ্ডধর্ম্ম নিতান্ত আবশ্যক, কেন না খণ্ডধর্ম্ম দ্বারাই স্বার্থ এবং পরার্থের সমঞ্জসীকরণ হয়।

খণ্ডধর্ম্ম শিক্ষা দেয় যে, তুমি কামস্কাট্‌কা দেশবাসী শীত-সন্তানকে এবং পুণ্যভূমিবাসী ভারতের আর্য্যসন্তানকে এক চক্ষুতে নিরীক্ষণ করিও না। বিদেশী বিধর্ম্মীর সহিত তোমার স্বার্থসম্বন্ধ নাই। তোমার সহিত এক তাড়িতে তাহার হৃদয় তাড়িত হয় না। সে তোমার সহিত একভাষী নহে; মহদ্বীজ মন্ত্র ঘোষণা করিলে, তোমার মনে যেরূপ ভক্তির আবির্ভাব হইবে, তাহার মনে সেরূপ হইবে না; ভারতীয় তীর্থস্থান পর্য্যটন করিলে তোমার যেরূপ অপরূপ আনন্দ হইবে, তাহার সেরূপ হইবে না। অতএব হৃদয় কুঞ্চিত কর, স্বধর্ম্মে পক্ষ-পাতী হও। এইরূপ উপদেশ হিন্দুধর্ম্ম প্রদান করে। এরূপ উপদেশ পালন করা সকলেরই আবশ্যক। এই উপদেশ পালন করিলে, ধর্ম্মরক্ষা হয়, সমাজরক্ষা হয়, দেশরক্ষা হয়, স্বার্থরক্ষা হয়, পরার্থরক্ষা হয়, হৃদয় হয়, একতা হয়। জীবন্ত খণ্ডধর্ম্ম হৃদয়মধ্যে থাকিলে সকলই হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্ম—কষ্টি পাথর।

সহজ-সাধ্য না হইলেও পালনীয়।

কষ্টি পাথরে ঘষিয়া যেমন সোণার ভাল মন্দ বুঝিতে হয় সেইরূপ ধর্ম্ম দ্বারাই কোন বিষয় উচিত অনুচিত বুঝিতে হয়; প্রথমে দেখিতে হইবে হিন্দুরা ধর্ম্ম কি ভাবে দেখেন।

জগতের যাবতীয় অনুষ্ঠানই দুই দিক্ দিয়া দুই ভাবে দেখা যাইতে পারে। কেবল অনুষ্ঠান কেন, যাবতীয় পদার্থই দুইটি বিভিন্ন ভাবে দেখা যাইতে পারে। এই মনুষ্য, খানিকটা অম্লজান, যবক্ষারজান, বায়ুবাষ্পের বিশেষ সমষ্টি,—রক্তমাংস, অস্থিমজ্জা, শুক্রশোণিতের অপূর্ব্ব তেরিজ,—বক্ষ, মস্তক, উদর, ঊরু, পাণি, পদ প্রভৃতি অবয়বের এক প্রকার জড়যোগ—বলিলেও চলে; আবার, জ্ঞানের গুরুভাণ্ডার, বুদ্ধির লীলাপট, শ্রীর রঙ্গভূমি, ভক্তির অপূর্ব্ব আধার—বলিলেও চলে।—এই ছোট ফুলের গাছটি—মূল, কাণ্ড, শাখা, উপশাখা, পত্র, ফুল, এই সকলের সমষ্টি বলা যাইতে পারে; আবার নয়নাভিরাম সৌন্দর্য্যের ক্ষেত্র, ঘ্রাণরঞ্জন সুগন্ধের খনি, হৃদয়উৎফুল্লকর কোমলতার ছবি, সদ্যোজাত শোভার সূতিকাগৃহ—এরূপ বলি-

লেও চলে। এই বিস্তীর্ণ ভারতক্ষেত্র কেবলমাত্র বিংশতি কোটি দাসের বাসভূমি,—আঠারটি ভাষার অধিষ্ঠান জন্য চারি লক্ষ বর্গক্রোশ ক্ষেত্র,—গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, কাবেরী প্রভৃতির প্রবাহের স্থান,—বিন্ধ্য হিমালয়াদির দাঁড়াইবার স্থল,—শাল-তাল-তমালের বিস্তীর্ণ উপবন,—ভারত সাগর, দক্ষিণ সাগর, আরব সাগর ত্রিসিন্ধুর ত্রিবিক্রমের অভিঘাত স্থল—এ ভাবে বলিলেও চলে; আবার অন্য দিক দিয়া—বৈদিক, দার্শনিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, নাস্তিক, বৈষ্ণব, ইসলাম, খ্রীষ্টান ধর্ম্ম সকলের সম্মিলন স্থল,—অনন্ত উৎসে উৎসারিত, কেন্দ্রাভিমুখে প্রসারিত জগদ্ব্যাপক ইতিহাস স্রোতের কেন্দ্রস্থিত জলপ্রপাত, —অধর্ম্ম তাড়নায় ধর্ম্মের পরীক্ষা-ভূমি—সহিষ্ণুতার আদর্শ-ক্ষেত্র,ভবঘোরচক্রের লীলা রঙ্গের বিষম উত্থান-পতনের ভীষণ নাগরদোলা,—সমগ্র ইতিহাসচক্রক পরিচালনের মূলশক্তি স্বরূপ সুমহৎ পেণ্ডুলম,—শৌর্য্যবীর্য্যের দোর্দ্দণ্ড ভূতকালের সহিত, কোমল হইতে কোমলতর ভক্তিভরা ভবিষ্যতের মিলন মন্দির,—ভারতক্ষেত্রকে এরূপেও দেখা যায়।

সকল বিষয়ই এইরূপ দুই দিক দিয়া দুই ভাবে দেখা যায়। মানবীয় সমস্ত অনুষ্ঠানেরই সুতরাং দুইটি পৃষ্ঠা আছে।

একটি ভাবকে স্বার্থের ভাব, জড়ের ভাব, ঐহিক ভাব, টাকা-আনা-পয়সার ভাব, পদার্থ বিজ্ঞানের ভাব, আর অন্যটিকে ধর্ম্মের ভাব, আধ্যাত্মিক ভাব, পারত্রিক ভাব, হিত মঙ্গল ভালবাসার ভাব, মনোবিজ্ঞানের ভাব, বলা যাইতে পারে।

এইরূপ করিয়া দুই ভাবে না দেখিলে কোন বিষয়ের প্রকৃত পর্য্যালোচনা হয় না। সকল বিষয়ের এ পীঠ ও পীঠ, দুই পীঠই এই ভাবে দেখা আবশ্যক।

আজি কালি একটা বড় বিষম বাতাস উঠিয়াছে; অনেকেই অনেক বিষয় কেবল বিজ্ঞানের চক্ষে দেখিতে উদ্যত; ধর্ম্মাধর্ম্মের, ভক্তি-ভালবাসার, দয়া-দাক্ষিণ্যের, হিতাহিত জ্ঞানের বৈজ্ঞানিক ব্যবচ্ছেদ আরম্ভ হইয়াছে; স্পর্দ্ধা করিয়া মহা মহা পণ্ডিতে বলিতেছেন যে, হিন্দুশাস্ত্র সমস্তই বৈজ্ঞানিক।

এ বড় বিষম কথা! আমাদের যৎসামান্য ক্ষুদ্র শক্তি কেন্দ্রস্থিত করিয়া আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই মতের প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করি।

কোন একটি তত্ত্বের বিজ্ঞান কেবল একটি পৃষ্ঠা দেখিতে পায় মাত্র। হিন্দুর মতে সেটুকু সামান্য অংশ, অত্যল্প বিস্তৃত ভাগ; সেটুকুর পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু গৌণ-কল্পে; ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ বহু বিস্তৃত অংশের পর্য্যালোচনা করাই, অগ্রে কর্ত্তব্য, মধ্যে কর্ত্তব্য, শেষে কর্ত্তব্য; সেইটিই মুখ্য কর্ত্তব্য। উচিত অনুচিত বুঝিতে হইলে, অনেকগুলি কথা দেখিতে হইবে।

একটি উদাহরণ দিব;—একজন লোক নদীতে পড়িয়াছে, হাবুডুবু খাইতেছে। তুমি একজন পণ্ডিত লোক, নিকটে তীরে দাঁড়াইয়া আছ; কথাটা মনে উঠিল, উহাকে উদ্ধারের চেষ্টা করিবে কি না? বিজ্ঞান কি পরামর্শ দেন, দেখ। বিজ্ঞান

প্রথমেই বলিলেন, অগ্রে দেখ, উহাকে উদ্ধার করিবার সম্ভাবনা কতটা আছে; স্রোতের বেগের সহিত তোমার শরীরের তুলনা কর; তুমি বলিলে তা'ত এখন হয়ে উঠে না। বিজ্ঞান বলিতেছে, তাহার পর দেখ, উহাকে উদ্ধার করিতে গেলে যে অতিরিক্ত বলের প্রয়োজন, তোমার দেহের বল হইতে নদীর স্রোতের বেগ বাদ দিয়া, ততটা বল তোমার আছে কি না; তাহার পর দেখ, উহাকে রক্ষা করিতে গিয়া তোমার প্রাণ হারাইবার সম্ভাবনা কতটুকু আছে। যদি সিকি সম্ভাবনাও থাকে, তাহা হইলে, তোমাকে আমি ঐ কার্য্যের জন্য অগ্রসর হইতে বলি না, কেননা তুমি ঐ আসন্নমৃত্যু লোক অপেক্ষা চৌগুণের অধিক কৃতী। বিজ্ঞানের পরামর্শ মত কাজ করা তোমার পক্ষে অসাধ্য হইল; এরূপ সম্ভাবনা অসম্ভাবনার ঠিক ফাজিল করিতে তুমি পারিলে না; তখন ধর্ম্মের দিকে তুমি তাকাইলে। ধর্ম্ম বলিলেন, কিসের গণনায় সময় নষ্ট করিতেছ? তুমি সাহায্য করিলে, যখন লোকটা রক্ষা পাইতে পারে, তখন তুমি আর নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়াইয়া কেন? কথাটা তোমার প্রাণের ভিতরে টং করিয়া বাজিল; ঘণ্টা শুনিলে যেমন দৌড়িয়া গাড়িতে উঠিবার জন্য আপনা আপনি দ্রুতপদে চলিতে হয়, তেমনই ভাবে সেই প্রাণের ভিতরের আওয়াজে নদীতে ঝাঁপ দিয়া পড়িলে; হঠাৎ তোমার চতুর্গুণ বল হইল; লোকটিকে উদ্ধার করিলে।

ইহাতে এই বুঝা যায় যে, বিজ্ঞানের পরামর্শানুসারে কার্য্য

করা অনেক সময় অসম্ভব ; ধর্ম্মের কথা সহজ, অথচ পরিষ্কার, তবে যাজনা করা তত সহজ নহে, Practical নহে। Practical নহে, সুতরাং ধর্ম্ম পালনীয়ও নহে এমনই একটা কথা আজি কালি শুনা যাইতেছে।

কথাটা উঠিয়াছে অনেক দিন, কিন্তু সে বৎসর রাজমুখে নিঃসৃতি পাইয়া বড়ই কলঙ্ক বহন করিয়াছে। সকল বিষয়েই লোকের এখন প্রাকৃটিকাল হইবার বড় ঝোঁক। প্রাকৃটিকাল হইবার না হউক, প্রাকৃটিকাল কথাটা লইয়া গণ্ডগোল করিবার বড়ই প্রবৃত্তি। যাহাতে টাকার ঝন্‌ঝনানি, বা পদাঘাতের কন্‌কনানি নাই, তাহাই প্রাকৃটিকাল নহে। সুতরাং চাকরী জিনিষটাই বিষম প্রাকৃটিকাল। এভাব অনেক দিন উঠিয়াছে, অনেক দিন চলিতেছে ; কিন্তু সে বৎসর রাজমুখে বিবৃত হইয়াছে যে, ধর্ম্ম যদি প্রাকৃটিকাল না হয়, তবে তাহা ধর্ম্মই নহে। প্রাকৃটিকাল বাদীরা বলেন, * যে সকল মত প্রাকৃটিকাল নহে, তাহা যে গভীরভাবে প্রচালিত হইয়াছে, তাহা বলা যাইতে পারে না। সেই সকল ধর্ম্মমত যদি কার্য্যে পরিণত করিতে যাই, তবে তাহাতে অনর্থপাত হইতে পারে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে, আমাদের সকলেরই মত যে,

* There are theories which are never serious, because they are not practical—We all hold theories which might be called dangerous if we ever thought of carrying them out ; we all hold the theory, for instance, that we ouyht to love our neighbours exactly as ourselves, but no one seems afraid, that we shall ever do so.

আমাদের প্রতিবেশিগণকে আমাদের আপনার মত ভালবাসা উচিত, কিন্তু কখন যে আমরা সেরূপ করিব, সে আশঙ্কা আমাদের নাই।

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, যাহা সহজে যাজনা হয় না, তাহা ধর্ম্মই নহে। এমন ঘোরতর সয়তানি মত, ধর্ম্মের এরূপ বিকৃত ব্যাখ্যা—আর হয় না।

মানব-চরিত্র সংগঠনের ও সঞ্চালনের আদর্শ ব্যবস্থার নাম ধর্ম্ম। আদর্শ বলিয়াই ধর্ম্মের সম্পূর্ণ যাজনা অসম্ভব; এবং সম্পূর্ণ যাজনা অসম্ভব বলিয়াই উহা আদর্শ।

কোন আদর্শের পূর্ণ ভোগ হয় না; সম্পূর্ণ আয়ত্তি হয় না; ধর্ম্ম কখন হস্তামলক হন না। কোণিক বক্ররেখা হাইপর-বোলার মধ্যস্থিত বজ্ররেখাদ্বয়ের মত, সাধুচরিত্র চিরদিনই ধর্ম্মের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, ক্রমে অধিক হইতে অধিকতর নিকটবর্ত্তী হয় কিন্তু কখনই স্পর্শ করিতে পারে না। অথচ ধর্ম্ম মরীচিকার মত মিথ্যা মোহজ পদার্থ নহে; ধর্ম্ম মরীচিকার মত ধোঁয়া ধোঁয়া,ঘোলা ঘোলা জিনিষ নহে; ধর্ম্ম মরীচিকার মত পিছাইয়া যায় না; ধর্ম্ম মরীচিকার মত বৃথা আশায় আশ্বাসিত করিয়া হঠাৎ নিরাশার কঠোরতায় আচ্ছন্ন করে না। ধর্ম্ম সত্য পদার্থ; নিত্য পদার্থ; উজ্জ্বল, শান্ত, ধীর, স্থির, আভাময়। ধর্ম্মের দিকে যত অগ্রসর হইবে, ততই তুমি আশ্বস্ত হইবে, শীতল হইবে। যে ধর্ম্মের দিকে কিঞ্চিৎ মাত্রও অগ্রসর হইয়াছে, তাহাকে কখনই ধর্ম্ম আর নিরাশে নিপাতিত করেন

না; অথচ চির জীবন, জন্মে জন্মে সাধু ব্যক্তি ক্রমেই ধর্ম্মের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন, কখনই স্পর্শ করিতে পারেন না। সামীপ্য ক্রমেই গাঢ়তর হয়, অথচ সাযুজ্য অনন্তকাল সাধ্য।

লক্ষ্য স্থির, সম্মুখে উজ্জ্বল আভায় বিরাজমান, পান্থ ক্রমেই অগ্রসর হইতেছেন, ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতেছেন, অথচ কখনই ধরিতে পারেন না; এই বিচিত্র জীবন্ত রহস্যেই ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য, ধর্ম্মের গৌরব, ধর্ম্মের আদর্শভাব ও ধর্ম্মের উপকারিতা। যে, ধর্ম্মের এই গূঢ় রহস্য বুঝে নাই, সেই ধর্ম্মকে Practical বা পূর্ণায়ত্ত করিতে চায়। Practical ধর্ম্ম আর অশ্বডিম্ব সমান কথা। যাহা অদ্য Unpractical আছে, কালে তাহাকে Practical করিবার চেষ্টার নাম বৈজ্ঞানিক চেষ্টা। আর যাহা আজি Unpractical, কল্য Unpractical, চিরদিনই Unpractical থাকিবে, এরূপ জানিয়া শুনিয়া যাহা আমরা Practice বা সাধনা করিতে যাই—তাহাই ধর্ম্ম।

এই দেবকন্যা বিদ্যুৎকে সংবাদবাহিকা করিব, এই বজ্রধর বাষ্পরাশিকে শকটচালক করিব, এই প্রশস্ত পর্ব্বত উড়াইয়া দিব, এই বিষম সমুদ্র শুষ্ক করিব, এই মহামরু শাহারায় সাগরতরঙ্গ খেলাইব, এ সকলই বৈজ্ঞানিকের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও কীর্ত্তি।

আর, যে আপনাকে ভুলিলে আমাদের অস্তিত্ব থাকে না, যে আপনাকে ভুলা অসম্ভব, ঘোরতর Upractical, সেই

আপনাকে ভুলিবার চেষ্টা করিব; আপনাকে ভুলিয়া পরের সেবা করিব; আপনারই অন্নসংস্থান করিয়া উঠিতে পারি না, অথচ পরকে দুমুটা দিতেই হইবে; নিজে রোগশোকের জ্বালায় অস্থির, তবু পরকে সান্ত্বনা দিব; অনেক সময় হয়ত সত্য বলিতে গেলে প্রিয় হয় না, প্রিয় বলিতে গেলে সত্য থাকে না, ইহা জানিয়াও তবু কেবল সত্য কথা ও প্রিয় কথা বলিবার চেষ্টা করিব; যিনি অসীম, অনন্ত, কল্পনার অতীত তাঁহার ধ্যান, ধারণা, উপাসনা, আরাধনা, সকলই অসম্ভব; তথাপি তাঁহার উপাসনা আরাধনা সকল সময়েই করিব—ধার্ম্মিকের আশা এইরূপ,আকাঙ্ক্ষা এইরূপ, কীর্ত্তি এইরূপ। আপাতত অসম্ভবকে কালে সম্ভব করার নাম বিজ্ঞান; নিত্য অসম্ভবের যাজনা করার নাম ধর্ম্ম। সুতরাং Practical ধর্ম্মের মত বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম কথাটা—নিতান্ত হাস্যকর শব্দসংযোগ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিবেক—কষ্টিপাথর নহে।

সহজ-জ্ঞান ও স্বচ্ছন্দতা।

(Conscience and Individuality).

কোন্‌টা পাপ, কোন্‌টা পুণ্য,—কেমন করিয়া জানিব? ধর্ম্ম, অধর্ম্ম—কি করিয়া বুঝিব? এইরূপ একটা প্রশ্ন, একটা খট্‌কা সকল কালে, সকল অবস্থাতেই অনেক মনুষ্যের মনে উঠে। কিন্তু সকল মনুষ্যের মনেই যে ধর্ম্মাধর্ম্মের তর্ক উঠিবে এমন কোন কথা নাই। পশুবৎ অসভ্য মানব ধর্ম্মাধর্ম্মের কোন ধারই ধারে না। সভ্যাভিমানী অনেকেও প্রবল নাস্তিকতা বশত ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার ভুলিয়া যান। আবার যাঁহারা প্রকৃত ভক্ত, যাঁহারা হৃদয়ের গূঢ়তম প্রকোষ্ঠ হইতে বিশ্বাস করেন যে, "ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"—তাঁহাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিবার প্রয়োজনই থাকে না। এইরূপ বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর কথা ছাড়িয়া দিয়া স্থূলত বলিতে পারা যায় যে, ধর্ম্মাধর্ম্মের একটা প্রশ্ন প্রায় সকল মানবের মনেই উঠে। প্রশ্নও উঠে, মীমাংসার জন্য আগ্রহও হয়।

যাঁহারা শাস্ত্রবাদী, অনেক স্থলেই ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার তাঁহাদের পক্ষে সহজসাধ্য হয়। শাস্ত্রে বিধি আছে, কাজেই এ কাজটা করিতে হইবে; ও কাজটা নিষেধ আছে, কাজেই সে কাজটা করা হইবে না। শাস্ত্র পালন করিতে পারুন আর নাই পারুন, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারে শাস্ত্রই যে একমাত্র বিচারক, ইহাই অনেকের ধারণা।

য়ুরোপে, প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে সাধারণ মানবের মন হইতে যেমন শাস্ত্রবাদ বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার কিরূপে হইবে,—এই প্রশ্নের আন্দোলনও ঘোরতর হইতে লাগিল। 'শাস্ত্র দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মের মীমাংসা হইবে', এ কথায় লোকের আর মন বুঝে না—কাজেই 'কিসের দ্বারা হইবে,' এই প্রশ্নেরই জল্পনা হইতে লাগিল।

য়ুরোপে যাঁহারা শাস্ত্রবাদ নষ্ট করিবার প্রধান উদ্যোগী, তাঁহারা অস্থি-মজ্জায় ঈশ্বরবাদী ছিলেন। ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব ও কৃপা তাঁহাদের মূলমন্ত্র। ধর্ম্মাধর্ম্ম কিরূপে বুঝিতে পারা যায়, এই আন্দোলনে কাজেই সকলে ঈশ্বরবাদী ধর্ম্মযাজকগণকে প্রশ্ন করিতে লাগিল যে, ঈশ্বর যদি পরম দয়ালু এবং সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা, তবে মানুষ যাহাতে সহজে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিভেদ করিতে পারে, তার কোনরূপ উপায় কি তিনি করিয়া দেন নাই? মানুষ এই লইয়া কি চিরকাল গণ্ডগোল করিয়া মরিবে? এ ঈশ্বরের কিরূপ কর্ত্তৃত্ব এবং কিরূপই বা দয়া? তখন কাজেই করুণাময় ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ববাদীরা উত্তরে বলিতে লাগিলেন—

সে কি কথা! ঈশ্বর কি মানুষকে অন্ধকারে রাখিয়াছেন! কখনই না। প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে এমন একটি আলো আছে, এমন একজন চিত্তগুরু আছেন যে, মানুষ যখনই কোন কাজ করিতে যাইবে, অমনই সেই আলো দেখিতে পাইবে, বুঝিতে পারিবে—সে কাজটা ভাল না মন্দ—সেই কষ্টিপাথরে পরিষ্কার কষ্ বুঝিতে পারিবে,—কাজটা খাঁটি না মেকি এবং সেই চিত্তগুরু, যদি ভাল কাজ করিতে যাও, তবে বলিবে, 'সাবাস্, সাবাস্', আর যদি মন্দ কাজ করিতে যাও, তবে বলিবে 'খবরদার বেটা এ কাজ করিস্ না।' একটা আলোর মত, একটা কষ্টির মত, একটা গুরুর মত তিনটা পদার্থ আছে, তাহা নহে। প্রত্যেক মনুষ্যের হৃদয়ে ঈশ্বরপ্রদত্ত এমনই একটি পদার্থ আছে যে, সেই পদার্থ দ্বারা মনুষ্য ভাল মন্দ সকলই দেখিতে পায়, ভাল মন্দের তারতম্য করিতে পারে, আর সেই পদার্থই হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে, সৎকার্য্যে উৎসাহ দেয়, মন্দকার্য্যে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করে এবং মন্দ কার্য্যের পর মনোমধ্যে গ্লানি উৎপাদন করে। এইরূপে Conscience বা সহজজ্ঞানবাদ য়ুরোপে জাহির হয়।

ক্রমে দাঁড়াইল, এই সহজজ্ঞান নির্ম্মল, বিশুদ্ধ, পবিত্র। সর্ব্বহৃদয়ে থাকেন, সর্ব্বদা সতর্ক থাকেন এবং সকলকে স্পষ্ট ভাষায় উপদেশ দেন। ইনি সত্যস্বরূপ, জ্যোতিঃস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ। সহজজ্ঞান ধীর, স্থির, শান্ত, অশান্ত, এবং অভ্রান্ত। ঈশ্বর মহাগুরু; সহজজ্ঞান উপগুরু। এই

সহজ জ্ঞানকে মানিয়া চলিলেই, সহজজ্ঞান কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ পথে না গিয়া সহজজ্ঞানের প্রদর্শিত পথে মনুষ্য চলিলেই, অনায়াসে মানুষ সর্ব্বধর্ম্ম পালন করিতে পারে। এই সহজজ্ঞান কাজেই শাস্ত্র-গুরু, পিতামাতা, ভাইবন্ধু, স্ত্রীপরিবার, সমাজ-স্বদেশ—সকলের উপরে আসন পাইল। এই সকল বলিদান দিয়া সহজজ্ঞানের পূজা আরম্ভ হইল। অমুক কন্‌সিয়েন্‌সের গৌরবরক্ষার্থ সমাজ ত্যাগ করিলেন; অমুক জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিলেন; অমুক সহধর্ম্মিণীকে পরিত্যাগ করিলেন; অমুক শাস্ত্রসকল দগ্ধ করিয়া সেই ভস্মরাশি নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন,—এইরূপে কন্‌সিয়েন্‌সের সেবা হইতে লাগিল। এই সহজজ্ঞানে সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাসবার্ত্তা য়ুরোপের সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসে, দর্শনে ও নীতিশাস্ত্রে জ্বলন্ত অক্ষরে পরিস্ফুট রহিয়াছে। হিন্দুর হৃদিস্থিত হৃষীকেশ নিয়োগকর্ত্তা, ভক্ত সেই নিয়োগমত কার্য্য করেন; কিন্তু এই হৃদিস্থিত উপগুরু নিয়োগ করিতেও যেমন, নিষেধ করিতেও তেমন। সুতরাং কন্‌সিয়েন্‌সের হাতে য়ুরোপীয়েরা ক্রীড়াপুত্তলীবৎ অগ্র পশ্চাৎ দুই দিকে চালিত হইতে লাগিলেন, তাহাতে মানুষ অনেকটা অস্থির হইয়া পড়িল।

এই বিংশ শতাব্দীতে য়ুরোপের রাজনৈতিক ইতিহাসে, সহজজ্ঞানের কোন প্রভুত্বই নাই,—দর্শনশাস্ত্রেও সহজজ্ঞানের প্রভুত্ব অনেক কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু ঈশ্বরবাদীদিগের নীতি-

শাস্ত্রে কন্‌সিয়েন্‌সের প্রতাপ প্রায় অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে বলিলেই চলে। তাই সেই নীতিশাস্ত্রের ছায়াবলম্বী তরলমতি বঙ্গীয় যুবা, সেই কন্‌সিয়েন্‌সের দোহাই দিয়া উপবীত ত্যাগ করেন, পিতা-মাতা হইতে পৃথক্‌ হইয়া তাঁহাদের মনে দারুণ কষ্ট দেন এবং সমাজ হইতে আপনি ইচ্ছাপূর্ব্বক পতিত হইয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন।

তরলমতিই হউন, আর গাঢ়মতিই হউন, সকল ইংরাজী-নবিশই জানেন যে, য়ুরোপের ঈশ্বরবাদমূলক নীতিশাস্ত্র ঈশ্বর-কৃপার প্রত্যক্ষ সাক্ষিস্বরূপ এই সহজজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সহজজ্ঞানবাদ ঈশ্বরবাদের ভিত্তিও বটে, চূড়াও বটে।

ঐ বিষয়ে এক ভৃগুপ্রথিত মানবধর্ম্মশাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিলেই দেখা যায় যে, সনাতন ধর্ম্মের মূল কি, প্রমাণ কি এবং পরিণাম কি—এই তিনটি বিচারের সময়েই, আত্মতুষ্টি এবং আত্মগ্লানির পরিষ্কার স্থান নির্দ্দেশ আছে। এই আত্ম-তুষ্টি এবং আত্মগ্লানির সমষ্টি অথচ আধারস্বরূপ পদার্থই কি য়ুরোপের কন্‌সিয়েন্‌স্‌ নহে ? হউক আর নাই হউক—মানবধর্ম্ম শাস্ত্রে আত্মতুষ্টির বা আত্মগ্লানির কিরূপ স্থান আছে, তাহাই দেখা যাউক।

সদাচার ধর্ম্মের একটি মূল, সদাচার ধর্ম্মের একটি লক্ষণ, সদাচার—ধর্ম্মের জান্‌,—আমাদের সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহা পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। ধর্ম্মের মূল কি এতৎ সম্বন্ধে ভৃগু বলিতেছেন যে, মনুর মত এই যে,—

"বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাং।
আচারশ্চৈব সাধূনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ॥" মনু ২।৬।

অখিল বেদ, বেদবিদ্‌গণের স্মৃতি ও শীল, সাধুগণের আচার ও আত্মতুষ্টি এই সমুদায় ধর্ম্মের মূল। স্থানান্তরে বলা হইয়াছে ব্রাহ্মণ্য, দেবপিতৃভক্তি, সৌখ্য, অপরোপতাপিতা, অনসূয়তা, মৃদুতা, অপারুষ্য, মৈত্রতা, প্রিয়বাদিত্ব, কৃতজ্ঞতা, শরণ্যতা, কারুণ্য, প্রশান্তি—এই তেরটি শীল।

ধর্ম্মের লক্ষণ সম্বন্ধেও প্রায় ঐরূপ বলা হইয়াছে,—

"বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্॥" মনু ২।১২।

বেদ, স্মৃতি, শিষ্টাচার ও আত্মতুষ্টি এই চারিটি ধর্ম্মের সাক্ষাৎ লক্ষণ বলিয়া (ঋষিগণ) নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শাস্ত্রকারেরা কেবল সাধারণভাবে ধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই; বিশেষ করিয়া আবার দশবিধ ধর্ম্ম বলিয়া দিয়াছেন ঃ—

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥" মনু ৬।৯২।

ধৃতি, ক্ষমা, দম, অচৌর্য্য, শৌচ, ইন্দ্রিয়সংযম, ধী, আত্মজ্ঞান, সত্যানুরাগ এবং অক্রোধ এই দশটি ধর্ম্মের লক্ষণ।

"আচারঃ পরমোধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এব চ।
তস্মাদস্মিন্ সদাযুক্তোনিত্যং স্যাদাত্মবান্ দ্বিজঃ।
আচারাদ্বিচ্যুতোবিপ্র ন বেদফলমশ্নুতে।
আচারেণ তু সংযুক্তঃ সম্পূর্ণফলভাগ্ ভবেৎ॥

এবমাচরতো দৃষ্ট্বা ধর্ম্মস্য মুনয়ো গতিম্।
সর্ব্বস্য তপসো মূলমাচারং জগৃহুঃ পরম্॥" মনু ১।১০৮-১১০।

শ্রুতি, স্মৃতি, বিহিত আচার পরমধর্ম্ম। অতএব আত্মবান্ দ্বিজ এই আচারের অনুষ্ঠানে সতত যত্নবান থাকিবে। আচার-ভ্রষ্ট বিপ্র বেদের ফলভাগী হন না। আচারযুক্ত হইলেই বেদের সম্পূর্ণ ফলভাগী হন। এইরূপে ঋষিগণ আচার দ্বারা ধর্ম্মের প্রাপ্তি অবগত হইয়া আচারকেই সকল তপস্যার প্রধান মূল বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

সদাচারের সহিত পাশ্চাত্য ধর্ম্মনীতির এরূপ কোন সম্বন্ধ নাই। পাশ্চাত্য নীতি স্পষ্টাক্ষরে বলে যে, তোমার নিজের কোন ক্ষতি না করিয়া, তোমার প্রতিবেশীদের সুখস্বচ্ছন্দতার কোনরূপ বিঘ্নবিপত্তি না ঘটাইয়া, তুমি স্বেচ্ছাচারী হইতে পার। তুমি যে তোমার ক্ষতিবৃদ্ধি বুঝিতে পার না, সুখ-স্বচ্ছন্দতা যে কি তোমার প্রতিবেশীরা তাহা বুঝিতে অক্ষম, অহঙ্কারসহচর পাশ্চাত্য জ্ঞান সে কথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে। স্ব স্ব প্রধানতা সদাচারের, শিষ্টাচারের মূলে নিয়তই কুঠারাঘাত করিতেছে। সদাচার তিষ্ঠিতেই পারে না।

তবেই দেখা যাইতেছে, ধর্ম্মের মূল অনুসন্ধানেই হউক, আর প্রমাণ অনুসন্ধানেই হউক, বেদ, স্মৃতি, সদাচারের পর আত্মতুষ্টির স্থান। যদি এমন দেখ যে, কোন দুইটি কার্য্যই বেদ-বিহিত, স্মৃতি-সম্মত এবং সদাচার-সম্মত, কিন্তু তাহার একটিতে তোমার আত্মতুষ্টি হয়, অন্যটিতে হয় না, তবে যেটিতে আত্মতুষ্টি হয়, সেইটি করাই তোমার ধর্ম্ম।

বেদ ভগবদ্বাক্য, সুতরাং অভ্রান্ত। বেদ জানিবার উপায় থাকিলে, বেদ জানিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম করাই সহজ; কিন্তু সকল সময়েই বেদ দুর্ব্বোধ্য, এখনকার দিনে একেবারে অবোধ্য। সুতরাং বেদবিদ্‌গণের কৃত স্মৃতি হইতে ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে হয়। কোন্ কোন্ মহর্ষির স্মৃতি প্রামাণ্য তাহা স্থির করা আছে। যথা—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ। ইহার মধ্যে আবার মনুর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রমাণ। এত অধিক যে, মনুর সহিত বাকি কয়জনের বিরোধ হইলে, মনুকেই মান্য করিতে হইবে। স্মৃতির পর সদাচার প্রামাণ্য। যাহা-দিগের স্মৃতি জানিবার উপায় নাই, তাহারা সদাচার-সম্মত জানিয়া কোন কার্য্য করিলেই সেটি ধর্ম্মকার্য্য হইবে। তাহার পর যেখানে সদাচার কি তাহা জানিবার উপায় নাই, অথবা পূর্ব্বে যেমন বলিয়াছি, সদাচারে এ-ও হয়, ও-ও হয় তখন আত্মতুষ্টিকেই বলবতী করিতে হইবে। এই যে আত্মতুষ্টিকে প্রমাণ বলা যাইতেছে, ইহা সখের প্রমাণ নহে, ধর্ম্মের প্রমাণ। আত্মতুষ্টি অগ্রাহ্য করিলে, অধর্ম্ম হইবে।

অন্যত্র মনু বলিয়াছেন ;—

"যৎ কর্ম্ম কুর্ব্বতোঽস্য স্যাৎ পরিতোষোঽন্তরাত্মনঃ।
তৎ প্রযত্নেন কুর্ব্বীত বিপরীতন্তু বর্জ্জয়েৎ॥" মনু ৪।১৬১।

যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে অনুষ্ঠাতার অন্তরাত্মার

পরিতোষ হয়, সেই কর্ম্ম যত্নপূর্ব্বক করিবে, তাহার বিপরীত যাহাতে হয়, তাহা ত্যাগ করিবে।

পূর্ব্বে ধর্ম্মের মূল বা ধর্ম্মের প্রমাণ বিচারে আত্মতুষ্টি সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা ধরিতে গেলে, দর্শনশাস্ত্রের কথা ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে আছে বটে, কিন্তু আত্মতুষ্টিকে মান্য করিয়া কোন কার্য্য করিতে হইবে, তাহাতে এমন কোন কথা নাই। কিন্তু চতুর্থ অধ্যায়ের এই শ্লোকে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, যাহাতে আত্মপ্রসাদ হয়, এমন কার্য্য করিবে, যাহাতে আত্ম-গ্লানি হয় তাহা বর্জ্জন করিবে। তাহা হইল স্পষ্ট বিধিনিষেধের কথা। কিন্তু ইহাতে এমন বুঝিতে হইবে না যে, সকল কার্য্যে আত্মতুষ্টিই একমাত্র কষ্টিপাথর। তা ত নয়,—তবে শাস্ত্রে যে সকল কার্য্যের কোন বিধিনিষেধ নাই, যাহা সদাচার-বহির্ভূত নহে, এমন সকল কার্য্যে আত্মতুষ্টিকে ধর্ম্মের এক মাত্র প্রমাণ বলিয়া মনে করিবে। 'কুর্ব্বীত' এবং 'বর্জয়েৎ' বিধিনিষেধের স্পষ্ট বাক্য। শাস্ত্রে নিষিদ্ধও নহে, অনাচারও নহে, অথচ কার্য্যটা করিবার সময় হইতেই তোমার মনে কেমন একটা 'খপ্ খপানি' হইতে লাগিল, নিশ্চয় জানিও তুমি সেই কার্য্যে অধর্ম্ম করিলে।

য়ুরোপের নীতিশাস্ত্র, শাস্ত্রবাদ পরিত্যাগ করিতে গিয়া, যেরূপ অগত্যা সহজজ্ঞানবাদের সৃষ্টি করিয়াছে, সেইরূপ য়ুরোপের ধর্ম্মনীতিশাস্ত্র রাজনীতিশাস্ত্রের প্রাধান্যবলে Liberty, Individuality, Independence নামে একরূপ

ভয়ঙ্কর স্বেচ্ছাচারবাদের সৃষ্টি করিয়াছে। যে সকল দেশে বিভিন্ন বিভিন্ন রাজায় ক্রমাগত বিগ্রহ হয়, এবং রাজায় রাজায় অনবরত বিদ্রোহ চলে, সে সকল দেশে আপদ্ধর্ম্ম প্রবল হয়। আত্ম-রক্ষাই প্রধান ধর্ম্ম হইয়া উঠে। পরাধীনতা মহা পাপ বলিয়া জ্ঞান হয়। দেশ, দেশের লোকের অধীন থাকিবে, তবেত মঙ্গল। যদি একজন রাজা থাকে, আর তাঁহার আজ্ঞা শুনিতে হয়, সেত গোলামি। এইরূপে স্থির হইল, শাস্ত্রবাদ গোলামি, শিষ্টাচার গোলামি—নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারই সুখ। অবশ্য এদেশেও এই বিষম মতবাদের ছায়া পড়িয়াছে। তাহার ফলে কিরূপ বিচার বিতর্ক চলিতেছে দেখুন—'রামকমল বাবু ভারি স্বাধীন প্রকৃতির লোক, কাহারও খাতির সুবাদ রাখেন না।' এইরূপ লোক, কিসে যে প্রশংসনীয় হয় তাহা বুঝা বড় কঠিন। অন্যায় অধর্ম্ম করিতে কেহ অনুরোধ করিলে, রামকমল বাবু তাহা শুনেন না, সে ভাল কথা। কিন্তু সৎ অসৎ কোন কার্য্যেই তিনি কাহারও খাতির সুবাদ রাখেন না, আর সেইটা যে তাঁহার গুণের মধ্যে কি ক'রে দাঁড়ায়, তাহা বুঝা যায় না। তবে মোটামুটি এই মাত্র বুঝা যায় যে, রামকমল বাবু য়ুরোপীয় একটা বিকৃত মতবাদের অহংকৃত অনুকরণ করিয়া থাকেন।

যে সকল কার্য্যে অন্তরাত্মার পরিতোষ হয়,তাহাই করিবে, যাহাতে আত্মগ্লানি হয় তাহা করিবে না—এ কথা যখন আমা-দের ধর্ম্মশাস্ত্রে রহিয়াছে, তখন আমাদের শাস্ত্রে যে (Liberty

বা Individuality) স্বচ্ছন্দানুবর্ত্তিতার যথেষ্ট স্থল রহিয়াছে, তাহা বেশ বুঝা যায়। তবে শাস্ত্রাচার এবং সদাচার বজায় রাখিয়া স্বচ্ছন্দাচার করিতে হইবে। এই স্বচ্ছন্দাচারের মূলমন্ত্রও শাস্ত্রে যথেষ্ট আছে। যুরোপীয় Individuality হইতে এই স্বচ্ছন্দাচারের প্রভেদ এই যে, যুরোপীয় স্বেচ্ছাচার স্বপ্রধান ; সনাতন ধর্ম্মের স্বচ্ছন্দাচার শাস্ত্রাচার ও সদাচারের মুখাপেক্ষা করে।

স্বচ্ছন্দাচারের শাস্ত্রোক্ত মূলমন্ত্র এইরূপে মনুতে দেওয়া হইয়াছে ;—

"যদ্‌যৎ পরবশং কর্ম্ম তত্তদ্‌যত্নেন বর্জ্জয়েৎ।
যদ্‌ যদাত্মবশন্তু স্যাৎ তৎ তৎ সেবেত যত্নতঃ॥
সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্‌।
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ॥" মনু ৪।১৫৯-১৬০।

যে সকল পরবশ কর্ম্ম, সে সকল যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবে ; যে সকল আত্মবশ কর্ম্ম সেই সকল অনুষ্ঠান করিবে। কোন প্রকার পরবশ হওয়াই দুঃখ ; সকল প্রকার আত্মবশ কার্য্যেই সুখ। সুখদুঃখের লক্ষণ সংক্ষেপে এইরূপ জানিবে।

এই যে পরের উপাসনাদি না করিয়া আত্মবশে থাকিবার শক্তি ও সুখ, তাহা আমাদের মধ্যে ক্রমেই কমিতেছে। গাড়ী, পাল্কী না হইলে এক পা চলিতে পারি না, চাকরটি সঙ্গে না থাকিলে পৃথিবী অন্ধকার। দশজনে হাততালি না দিলে, কোন সৎকার্য্যেই প্রবৃত্তি হয় না। সাহেবদের দণ্ড-

বিধিতে নিষেধ নাই, কাজেই বুঝিতে পারি না যে, মদ খাওয়া, গণিকাগমন—এ সকল মহাপাপ। এই যে পরবশতা আমাদের সমাজের সকল শ্রেণীর মধ্যে নিত্য প্রবেশ করিতেছে, এইরূপ পরবশতা আমাদের দুঃখের নিদান। শাস্ত্রোক্ত আত্মতুষ্টির নিতান্ত বিকৃতবাদ—য়ূরোপীয় সহজজ্ঞানের দোহাই দিয়া, শাস্ত্র এবং সদাচার উল্লঙ্ঘন করিয়া, আপনার আত্মবশতা (Individuality or Independence) রক্ষা করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ, নীতিবিরুদ্ধ, দর্শনবিরুদ্ধ। ওরূপ আচরণের মূলে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, দুটা জিনিষ থাকে। এক য়ূরোপীয় বিকৃত নীতিবাদের অজ্ঞাতভাবে অনুকরণ, আর এক ইংরাজী বিদ্যার সহজাত অহঙ্কার। পান-আহারের নিয়ম মানিলাম না, জাতি-বিজাতি মানিলাম না, সময় অসময় মানিলাম না, ছাত্র-মিত্র-পুত্র-কলত্রকে অনবরত অনিয়মের দৃষ্টান্ত দিয়া, দীর্ঘচ্ছন্দে আত্মাদর সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া ক্রমে যকৃৎজীর্ণ হইয়া, শিরঃপীড়ায় অভিভূত হইয়া, বিষম ব্রণরোগে ছত্রিশ বৎসর বয়সে শফরীলীলা শেষ করিলে—ধর্ম্ম ত নাই-ই ভাই, তাহাতে পুরুষার্থও কিছুমাত্র নাই। সমাজ শিক্ষাদায়ে বিজাতীয় বিকৃত নীতিতে পরিব্যাপ্ত, এ সময়ে যথাসাধ্য সমাজরক্ষা, পরিবার রক্ষা, সদাচাররক্ষা করিতে পারিলেই পুরুষার্থ লাভ। ভাল, ধর্ম্মই যেন বুঝিলে না, কিসে সুখস্বচ্ছন্দতা হয়, তাহাও কি বুঝিতে পারিবে না?

———

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্ম—সনাতন সমাজের একমাত্র আধার ও অবলম্বন।

আমরা যেন ক্রমেই একটু একটু বুঝিতে পারিতেছি যে, সকল প্রকার স্তরের অন্তরে অন্তরে একটি সাধারণ স্তর আছে। মানব-তত্ত্ব, সমাজ-তত্ত্ব, জড়-তত্ত্ব, জীব-তত্ত্ব—পুরাণ, ইতিহাস—কবিত্ব, সাহিত্য—শ্রদ্ধা, ভক্তি,—সকল স্তরের অন্তরে একটি মহান্ ও বিশাল স্তর, সকলের আধাররূপ, আশ্রয়রূপ হইয়া অবলম্বনভাবে বিরাজ করিতেছে। সেই আধারের সহিত আধেয় সকলের সম্বন্ধ না বুঝিলে, কি অবলম্বনে জীবতত্ত্বাদি অবস্থিত, তাহা উপলব্ধি করিতে না পারিলে, কোন বিষয়েই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান হওয়া অসম্ভব। এই যে সমুদ্রে কত জীব-জন্তু—কত রত্নরাজি—কত পাহাড়পর্ব্বত— কত প্রকার শৈবালদাম রহিয়াছে,—সে সকলের আকৃতি প্রকৃতি বুঝিতে গেলে আমরা কি সমুদ্রের সহিত ঐ সকলের কি সম্বন্ধ তাহা না ভাবিয়া, পরিষ্কারভাবে কিছু বুঝিতে পারি? তাহা পারি না। লবণাম্বুমধ্যে বাস করে বলিয়া সাগরচর জীবগণের রক্তমাংস কিরূপ বিশেষ গুণযুক্ত হয়, সাগরের অন্তঃপ্রবাহ তরঙ্গাভিঘাতে পাহাড় পর্ব্বতের গঠন কিরূপে বিভিন্ন হইয়া থাকে, জলমধ্য হইতে বায়ু নিষ্কাশন করিয়া কিরূপে জীবগণ নিশ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া সমাধান করে, সামান্য উত্তাপে, আলোক

অভাবে জলতলে শৈবালাদি কি কৌশলে বৰ্দ্ধিত হয়, ইহার কোন একটি কথা বুঝিতে হইলেই, অগ্রে সমুদ্রের প্রকৃতি এবং কৃতি বুঝিতে হইবে। যেরূপ সমুদ্রতত্ত্ব উপেক্ষা করিয়া সাগরচর জীবাদির আকৃতি বা প্রকৃতি সম্যক বুঝিতে পারা অসম্ভব, সেইরূপ যে বিশাল মহান্ স্তর সমাজতত্ত্বাদির আশ্রয়স্বরূপ, অবলম্বনস্বরূপ হইয়া ঐ সকলকে গর্ভে ধারণ করত অনবরত উহাদের পুষ্টিসাধন, অবস্থাপরিবর্ত্তন এবং ক্ষয়সাধন করিতেছে, তাহা উপেক্ষা করিয়া, সে যে অবলম্বন এবং আশ্রয়, কিয়ৎপরিমাণে উপাদান এবং হেতু, তাহা না বুঝিয়া,—সেইটিই সকল তত্ত্বের সারতত্ত্ব—সম্পূর্ণরূপ না হউক কিন্তু অংশত সকল তত্ত্বের একেবারে সমবায়ী, অসমবায়ী এবং নিমিত্ত কারণ,—ইহা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম না করিয়া,—কোন তত্ত্বের কথা কহিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। চিন্তাশীল বাঙ্গালী দেখিতে দেখিতে এই অন্তর স্তরের আভাস পাইয়াছেন। একটু একটু বুঝিতেছেন যে, সেই মূলীভূত সারস্তরের কথা উপেক্ষা করিয়া সাম্যবাদ বা বৈষম্যবাদ, বিতর্কবাদ বা স্থিতিবাদ, কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। সেই বিশাল মহান্ আশ্রয় স্তরের নাম—ধৰ্ম্ম। নবযুগের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী একটু একটু বুঝিতেছেন যে, ধৰ্ম্মে উপেক্ষা করিলে আমরা কোন তত্ত্বই বুঝিব না, আমাদের কোন উন্নতিই হইবে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্মের যাজনা সাধ্যমত কর্ত্তব্য।

"......And it may with truth be asserted that no description of Hinduism can be exhaustive which does not touch on almost every religious and philosophical idea that the world has ever known.

Starting from the Veda, Hinduism has ended in embracing some thing from all religions, and in presenting phases suited to all minds. It is all-tolerant, all-compliant, all-comprehensive, all-absorbing. It has its spiritual, and its material aspect, its esoteric and exoteric, its subjective, and its objective, its rational and irrational, its pure and impure. It may be compared to a huge polygon or irregular multilateral figure. It has one side for the practical, another for the severely moral, another for the devotional and imaginative, another for sensuous and sensual and another for the philosophical and speculative. Those who rest in ceremonial observances find it all-sufficient; those who deny the efficacy of works and make faith the one requisite, need not wander

from its pale ; those who are addicted to sensual objects may have their tastes gratified ; those who delight in meditating on the nature of God and man, the relation of matter and spirit, the mystery of separate existence and the orgin of evil, may have indulged their love of speculation. And this capacity for almost endless expansion causes almost endless sectarian divisions even among the followers of any particular line of doctrine.

In unison with its variable character, and almost universal receptivity, the religious belief of the Hindus has really no succinct designation. Looking at it in its pantheistic aspect, we may call it Brahmanism ; in its polytheistic development, Hinduism ; but these are not names recognised by the natives".

"Hinduism"—Monier Williams.

বাস্তবিক এমন বলা যাইতে পারে যে, হিন্দুধর্ম্মের পূরাপূরি বিবরণ দিতে গেলে, এতকালে সমগ্র জগতে ধর্ম্মের কথা, দর্শনের কথা যাহা কিছু হইয়াছে—তাহার সকল কথারই আভাস দিতে হয়। বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া, সকল ধর্ম্মের কিছু না কিছু ক্রোড়ে লইয়া, সকলরূপ চিত্তবৃত্তির উপযোগী চিত্র প্রদর্শন করিয়া হিন্দুধর্ম্মের পরিণাম হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম সম্পূর্ণ উদার, সকল কথা মানিয়া লয়, সমস্ত ধারণ-ক্ষম, এবং সকল ধর্ম্মের সার গ্রহণে আপনার পোষণ করিতে পটু। হিন্দুধর্ম্মের

আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিকভাব আছে। প্রকট ও গূঢ় ভাব আছে। মানসগ্রাহ্য এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভাব আছে। বুদ্ধি-সঙ্গত এবং নির্ব্বোধের ভাব আছে। পবিত্র ও অপবিত্র ভাব আছে। একটি বিষম বহুকোণী বহুভুজ অবয়বের সঙ্গে ইহার তুলনা হইতে পারে। এই ধর্ম্মের একটা কাজের দিক আর একটা কঠোর ধর্ম্মের দিক আছে। একটি ভক্তি ও কল্পনার দিক আছে। একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়সেবার দিক আছে; আর একটি দর্শনের এবং ধ্যানধারণার দিক আছে। যাহারা ক্রিয়াকর্ম্ম করিয়া সন্তুষ্ট, তাহারা হিন্দুধর্ম্মে যথেষ্ট উপায় পায়। যাহারা কর্ম্মের উপযোগিতা মানে না, ভক্তির পন্থাই একমাত্র পন্থা বলে, তাহাদের হিন্দুধর্ম্ম হইতে দূরে কিছুই খুঁজিতে হয় না। যাহারা ধর্ম্মসাধনে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে ভাল বাসে হিন্দুধর্ম্মেই তাহাদের প্রবৃত্তির পোষণ হয়। যাহারা ঈশ্বর ও জীবের স্বরূপ, জড় ও জীবের সম্বন্ধ,দ্বৈতবাদের রহস্য, জগতে দুঃখের আবির্ভাব, এই সকল বিষয়ে ধ্যানধারণা করিতে ইচ্ছুক, তাহারা হিন্দুধর্ম্মের মধ্যেই যথেষ্ট উপকরণ পায়। হিন্দুধর্ম্মে এইরূপ অনন্তবিস্তার শক্তি আছে বলিয়া এক এক তন্ত্রের যাজক মধ্যেও নানা উপধর্ম্মযুক্ত শাখা-প্রশাখা হইয়াছে।

হিন্দুধর্ম্মের এই নানা পরিবর্ত্তনশীল মূর্ত্তি থাকাতে এবং এই বিশ্বোদরভাব পূরিত হওয়াতে, এই ধর্ম্মের একটি ছোটখাট নাম নাই, ইহার সর্ব্বেশ্বর ভাব দেখিয়া ইহাকে বলিতে পার

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ; নানা দেবতার কথা ভাবিয়া, বলিতে পার ইহা হিন্দুধর্ম্ম কিন্তু হিন্দুরা এই সকল নাম স্বীকার করে না।

আমরা হিন্দুসন্তান, আমরা আমাদের ধর্ম্মের বিশ্বব্যাপক ভাব বুঝিতে পারিনা, কিন্তু দেখ একজন বিদেশী খ্রীষ্টান ঐ ভাবটি কেমন সুন্দর বুঝিতে পারিয়াছেন। মুসলমান ধর্ম্ম, খ্রীষ্টান ধর্ম্ম বলিলে, যেরূপ এক এক প্রকার স্বতন্ত্র ও বিশেষ পদার্থ বুঝা যায়, হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া তেমন একটি স্বতন্ত্র ও বিশেষ পদার্থ নাই। আমাদের ধর্ম্মের এই বিশ্বব্যাপক ভাব আমরাও নানা ভাবে বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিশাল মহান্ আশ্রয় স্তরের নাম ধর্ম্ম।

ধর্ম্মের নানাভাব, ধর্ম্মের নানা মূর্ত্তি। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, সমগ্র ধর্ম্মের বিশাল বিশ্বোদর ভাব শ্রেষ্ঠ মানবেও ধারণা করিতে পারেন না। এই জন্য ধর্ম্ম বিষয়ে নানা দেশে নানা মত আছে ; এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মত প্রচলিত হইয়াছে। কেহ বলেন, ধর্ম্মের প্রাণ—ভয়। ঈশ্বর ভয়, পরকাল ভয় বা কর্ম্মফল ভয়, যাহার হৃদয় জীবন্ত নহে, তাহার ধর্ম্মজ্ঞান নাই। কেহ বলেন, ধর্ম্মের প্রাণ—ভক্তি। ভগবান ভক্তের ; ভক্তিতেই ভগবান মিলেন। কেহ বলেন, ধর্ম্মের প্রাণ—কর্ম্ম। যে যেমন কর্ম্ম করে, সে তেমনই ফল পায় ; কঠোর কর্ত্তব্যসাধনই ধর্ম্মযাজন। কেহ কেহ এই মতের বিপরীত বাদী। তাঁহারা বলেন, কর্ম্মে বিরতিই প্রকৃত ধর্ম্ম-চর্চ্চা। তবেই ধর্ম্মের প্রধান

সাধন কিরূপ, এবং ধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্যই বা কি ইত্যাদি বিষয়ে নানা মত প্রচলিত আছে।

ধর্ম্মের উপজীব্য ভগবানের সেইজন্য নানামূর্ত্তি হইয়াছে। উপনিষৎ একবার বলিতেছেন তিনি "শান্তং শিবমদ্বৈতং", আবার একবার বলিতেছেন "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং"। তন্ত্র এক মুখে একই নিশ্বাসে একেবারে বলিতেছে, "করাল বদনাং" অথচ "স্মিতাননাং"। কোথাও শুনিবে তাঁহার দ্বিভুজ মুরলীধর সুবঙ্কিম নটবর বেশ, আবার কোথাও শুনিবে তিনি শরকার্ম্মুক-ধারী বীরশ্রেষ্ঠ বীরাসনে উপবিষ্ট। বাইবলে বলে, তিনি কঠোর ন্যায়পর অথচ দয়ার অগাধ সাগর। যীশুখ্রীস্ট বলেন, তিনি পরমপিতা পরমেশ্বর। তন্ত্র বলেন তিনি করুণাময়ী জগদম্বা। যাঁহারা বালক গোপালের সেবক, তাঁহারা ভগবানকে অপত্যভাবে ধুয়াইয়া পুঁছাইয়া দুগ্ধদানে সেবা করিতেছেন; আবার বামাচারী শক্তিভক্ত, নরকপালে মহামাংস মদ্য দিয়া ভগবতীর মহাভোগের আয়োজন করিতেছে। সম্প্রদায় বিশেষের পূজার পদ্ধতির কথা শুনিলে সন্ত্রাসে সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হয়, হৃৎপদ্ম কাঁপিতে থাকে, মন স্তব্ধ হয়; আবার আর এক সম্প্রদায়ের পূজাপীঠের নিকটে গেলে, স্বচ্ছন্দ আয়োজন দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত হয়, পবিত্র বাদিত্রে শ্রবণ জুড়ায় এবং সুগন্ধে অন্ধীভূত হইতে হয়।

সনাতন ধর্ম্মের সার কথা এই যে, প্রকরণ পদ্ধতি, ধ্যান ধারণা, আলম্বন বিভাবন—পৃথক হইলেও সকল শ্রেণীর ঐশ্ব-

রিক সাধনাই ধর্ম্ম। দেশ, কাল, পাত্র—জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা—প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, রুচিভেদে—যাজনার তারতম্য হয় মাত্র। কোন ধর্ম্মে হিংসা করিতে নাই। যে, যে পথে পার, ধর্ম্মের উজ্জ্বল বিমল বিমানব্যাপী পতাকা লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হও। এই সকল সনাতন ধর্ম্মের সারকথা।

যে ভাবে মহাকাল এই বিশাল ধরণীপৃষ্ঠে স্তরের পর স্তর সংগ্রহ করিয়াছেন, সেই ভাবে কালমাহাত্ম্যে সনাতনধর্ম্মে স্তরের উপর স্তর উঠিয়াছে। এখন যাহা দাঁড়াইয়াছে, আমাদের উদ্ধৃত ইংরাজিতে প্রথমেই তাহা বলা হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিতেছেন, যাবতীয় ধর্ম্মমত এবং দর্শনতত্ত্ব অল্প স্বল্প না বুঝিলে, হিন্দুর ধর্ম্ম প্রকৃতপ্রস্তাবে বুঝা যায় না।

এই কথাটিতে অনেক গোলের কথা উঠিতে পারে। যদি জগতের যাবতীয় ধর্ম্ম এবং দর্শন মোটামুটি বুঝিয়া হিন্দুর ধর্ম্ম বুঝিতে হয়, তাহা হইলে আমরা হিন্দুসন্তান প্রায় সকলেই ত মারা পড়িলাম। আমরা জগতের ত কিছুই জানি না; সুতরাং হিন্দুর ধর্ম্ম যে কি, তাহাত আমাদের বুঝা হইল না।

এই বিষম সমস্যার তিন প্রকার মীমাংসা আছে। প্রথম কথা, হিন্দুর ধর্ম্ম যে কিরূপ জিনিষ, তাহা বুঝিতে না পার, নাই পারিলে, তাহাতে মারা পড়িবে কেন? আমাদের অন্ন পদার্থটি যে কি, তাহা যদি না বুঝি, তাহা হইলে আমরা মারা যাই কি? তা যাই না। তবে আমাদের ধর্ম্ম কিরূপ পদার্থ, তাহা না বুঝিলে, আমরা মারা যাইব কেন? যেমন

বিশেষ বিশেষ স্থলে ডাক্তার কবিরাজদের কথা শুনিলে এবং সাধারণত পূর্ব্বপুরুষদের প্রথা অনুসরণ করিলেই, অন্ন পান বিষয়ে আমাদের মারা পড়িতে হয় না, সেইরূপ বিশেষ বিশেষ স্থল ছাড়া সাধারণত ধর্ম্ম বিষয়েও পূর্ব্বপুরুষদের প্রথা অনু-সরণ করিলেই আমাদের চলে।

দ্বিতীয়ত, আমরা কেহই যে কিছুমাত্র বুঝি না, এমন নহে; অল্প বিস্তর সকলেই একটু আধটু বুঝি; যখন যতটুকু বুঝি, তখন ততটুকুরই মত কার্য্য করিব, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ আরও অধিক বুঝিবার চেষ্টা করিব। কি বিষয়কার্য্যে, কি জ্ঞান-শিক্ষায়, কি বিজ্ঞানে, কি ইতিহাসে,—সকল বিষয়েই আমরা ঐরূপ প্রণালী অবলম্বন করি; তবে কেবল ধর্ম্মচর্চ্চার বেলা, অন্যরূপ প্রথা অবলম্বনীয় মনে করিব কেন? এবং হতাশ হইবই বা কেন? যখন সামান্য অঙ্কবিদ্যা বা পাটীগণিতের চরম বুঝিতে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণও পারেন না, তখন চরম বিদ্যাশিক্ষার চূড়ান্ত প্রাপ্তির জন্য বাতুলের আশা করিব কেন? যতটুকু পথ দেখিতে পাইব, অগ্রসর হইব; যেখানে পথ না দেখিতে পাইব, দাঁড়াইয়া থাকিব; আলো জ্বালিতে পারিলে বা আলোকভিক্ষা পাইলে, আবার যতটুকু পথ দেখিতে পাইব, ততটুকুই অগ্রসর হইব। ইহাই বুদ্ধি-বিবেকা-নুমোদিত চিরন্তনী প্রথা। এমন সর্ব্বকালের, সর্ব্বজনের অনুসরণীয় প্রথা পরিত্যাগ করিব কেন? সুতরাং হিন্দুসন্তান হিন্দুর ধর্ম্ম বুঝি না,—কিনা, সম্পূর্ণরূপে বুঝি না, বলিয়া আমা-

দের হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। তবে দিন দিন অধিক তর রূপে বুঝিবার চেষ্টা করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

তৃতীয়ত, পাশ্চাত্য পণ্ডিত যে বলিয়াছেন, 'জগতের যাবতীয় ধর্ম্মমত এবং দর্শনতত্ত্ব অল্প স্বল্প না বুঝিলে হিন্দুর ধর্ম্ম প্রকৃতপ্রস্তাবে বুঝা যায় না'—কথাটি ঠিক, কিন্তু ওটি আধখানা কথা মাত্র। বাকি আধখানা হিন্দুর উক্তি,—হিন্দু-ধর্ম্ম বুঝিতে পারিলেই, জগতের যাবতীয় ধর্ম্মমত এবং দর্শনতত্ত্ব অল্প স্বল্প বুঝিতে পারা যায়। অর্থাৎ যেমন একদিকে জগৎ বুঝিলে হিন্দুধর্ম্ম বুঝা যায়, সেইরূপ অন্যদিকে হিন্দুধর্ম্ম বুঝিলে জগৎ বুঝা যায়। অহিন্দুর পক্ষে, বিশেষ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের পক্ষে, হয়ত জগৎ বুঝিয়া হিন্দুয়ানি বুঝা সুবিধাজনক হইবে; কেন না তিনি জগৎ বুঝিতে প্রথম হইতে অভ্যাস করিয়াছেন, এবং হয়ত জগতের অনেক জানেন, অথচ হিন্দুধর্ম্মের কিছুই জানেন না। আর আমাদের হিন্দুর পক্ষে হিন্দুয়ানির সঙ্গে সঙ্গে জগৎ বুঝিবার চেষ্টা করাই বোধ হয় সুবিধাজনক। কেননা আমরা মহামূর্খ হইলেও হিন্দুয়ানির একটু আধটু অবশ্যই বুঝি।

আমরা অনেকেই বুঝিতে পারিতেছি যে, জীবনের সর্ব্ববিধ কর্ম্ম লইয়াই হিন্দুর ধর্ম্ম। কর্ম্ম সচরাচর তিনভাগেই বিভক্ত হইয়া থাকে। শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক। পানাহার, স্নানাচমনাদি শারীরিক কর্ম্ম; শ্রবণ স্মরণাদি মানসিক কর্ম্ম; উপাসনাদি আধ্যাত্মিক কর্ম্ম। ইহার সকল কর্ম্মেই হিন্দুর ধর্ম্ম আছে। কোন বিষয়েই হিন্দুর ধর্ম্ম হিন্দুকে যথেচ্ছাচারে প্রশ্রয় দেয় না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ধর্ম্ম ও ধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা।

ধর্ম্মের চরমোন্নতিই মনুষ্যোন্নতির শেষ সীমা, কেন না ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্ব একই কথা। আর্য্যগণ এই কথাটি সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া উন্নতির চরম লোকে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। তাই আজি আমরা তাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্যে ধর্ম্মভাব উজ্জ্বলরূপে দেখিতে পাই; তাঁহাদের রাজনীতিতে—ধর্ম্ম, তাঁহাদের সমাজনীতিতে—ধর্ম্ম, তাঁহাদের গার্হস্থ্যনীতিতে—ধর্ম্ম, তাঁহাদের আবালবৃদ্ধবনিতার প্রত্যেক দৈনন্দিন কার্য্যে—ধর্ম্ম। ধর্ম্ম ভিন্ন তাঁহারা কিছু জানিতেন না, ধর্ম্মানুশীলন না হয়, এমন কার্য্য তাঁহারা করিতেন না।

অনেক দিন পরে ভারতবর্ষে আবার সেই ধর্ম্মের কথা শ্রুত হইতেছে, অনেক দিন পরে মূর্চ্ছাপ্রসুপ্ত আর্য্যজাতির পুনরায় জীবনীশক্তি দেখা দিতেছে।

তাই আজি আর্য্যক্ষেত্রে ধর্ম্মের কথা শুনিলে মনে বড় আনন্দ হয়; সেই ধর্ম্মের আবিষ্কর্ত্তা ও প্রতিষ্ঠাতা মহামহোপাধ্যায় মহর্ষিগণের মহিমা-কীর্ত্তন শুনিলে, মন আহ্লাদে নাচিয়া উঠে। আমাদের ইচ্ছা হয়, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সেই অন্দোলনে যোগ দিই, উন্মত্ত হইয়া সেই মহিমা-কীর্ত্তনে আত্ম-

সমর্পণ করি, আমাদের এই ক্ষুদ্র শক্তি, যত কেন সামান্য হউক না, সেই ধর্ম্মচর্চ্চায় উৎসর্গ করি।

কিন্তু যখন সেই ধর্ম্মের গুরুত্বের কথা মনে হয়, তখন মনে বাস্তবিকই ভীতির উদয় হয়। যে ধর্ম্মের উপর ভিত্তি করিয়া আর্য্যগণ উন্নতির বৈকুণ্ঠধাম নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন, যে ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া আর্য্যজাতির এত অধঃপতন হইয়াছে ও যে ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া আর্য্যজাতিকে আবার উন্নতির সেই লোকে উত্থান করিতে হইবে, সে ধর্ম্ম বড় সাধারণ পদার্থ নহে। অতি সাবধানে, অতি সন্তর্পণের সহিত, সেই ধর্ম্মের পথ পুনর্ব্বার পরিষ্কৃত, সংস্কৃত করিতে হইবে। ক্ষিপ্রকারিতা ও অদূরদর্শিতা সকল দিক মাটি করিয়া ফেলিবে ও আমাদিগকে বিপদ হইতে বিপদান্তরে নিপাতিত করিবে।

এই প্রবন্ধে আমাদের আলোচনার বিষয়,ধর্ম্ম ও ধর্ম্মানুষ্ঠাতার মধ্যে কে কাহার অধীন? অনুষ্ঠাতার অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কি ধর্ম্মেরও পরিবর্ত্তন হইবে, না ধর্ম্ম অপরিবর্ত্তনীয় এবং সেই ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া মনুষ্যের সকল প্রকার পরিবর্ত্তনকে সংযত ও ধর্ম্মসাধনোপযোগী করিয়া প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে?

একটু প্রণিধান করিলে বুঝা যাইবে ধর্ম্ম কখনও পরিবর্ত্তিত হইবার নহে। ধর্ম্ম ত কাল্পনিক পদার্থ নহে যে পরিবর্ত্তনশীল হইবে। যাহার জন্য বস্তুর অবস্থিতি এবং যাহা না থাকিলে বস্তুর অবস্থিতি থাকে না, যাহা বস্তুর প্রকৃতি স্বরূপ, তাহাই

তাহার ধর্ম্ম ; মনুষ্যের ধর্ম্মও সেইরূপ। যে বিশেষ গুণগুলি আমাদিগকে পশু পক্ষ্যাদি প্রাণী-জগৎ হইতে পৃথক করিতেছে, যে বিশেষ গুণগুলি সূক্ষ্ম বীজ ভাবে থাকাতে আমরা মনুষ্য, যে সূক্ষ্ম বিশেষগুণ গুলি না থাকিলে আমাদের মনুষ্যত্ব থাকিতে পারে না, সেই বিশেষ গুণগুলিই আমাদের ধর্ম্ম। সেই গুণগুলি আত্মজ্ঞান, বিবেক, বৈরাগ্য, ভক্তি, শ্রদ্ধা, ঔদাসীন্য, ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয় প্রভৃতি। এই ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিগুলি আছে বলিয়াই আমাদের এই মনুষ্য প্রকৃতি। এই ধর্ম্মের ক্ষয়ে শুধু যে মনুষ্যের অনিষ্ট হয় এমন নহে, মনুষ্যের আকার পর্য্যন্তও পরিবর্ত্তিত হয়। এমন কি বংশপরম্পরায় মানুষ বনমানুষ অথবা অন্য কোন নিকৃষ্ট জাতিতে পরিণত হইতে পারে।

মনুষ্যত্বই যদি ধর্ম্ম হইল ও ধর্ম্মের ক্ষয়ে যদি মনুষ্যত্বের ও মনুষ্যাকারের হানি হয়, তাহা হইলে মনুষ্যের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। যে পর্য্যন্ত মনুষ্য মনুষ্য থাকিবে, সে পর্য্যন্ত মানব-ধর্ম্ম অপরিবর্ত্তনীয় থাকিবে। ধর্ম্মের প্রকৃতি সনাতনী। তুমি সবলই থাক, আর দুর্ব্বলই থাক, তুমি স্বাধীন থাক আর পরাধীন থাক, ধর্ম্ম তোমার অবস্থার দিকে চাহিবে না। দুই লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে যে আত্মজ্ঞান মনুষ্যের সকল ধর্ম্মের সারভূত ধর্ম্ম ছিল, আজিও তাহাই আছে। তুমি আমি অবস্থার দাস হইয়া সাধনা করিতে পারিব না বলিয়া যে. আত্মজ্ঞান মানব ধর্ম্মের মধ্যে গণ্য

হইবে না, কি সাধনা না করা জনিত ফল তোমাতে আমাতে স্পর্শিবে না, তাহা নহে।

ধর্ম্ম যদি অনুষ্ঠাতার অপেক্ষা না করিল, তাহা হইলে বুঝা-গেল অনুষ্ঠাতাকেই ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হইবে। তুমি যে কোন অবস্থায় থাক না কেন, তোমাকে সর্ব্ব প্রযত্নে সেই একই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

এক্ষণে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন লইয়া দুই একটি কথা আছে। দুইভাবে আমরা অবস্থার পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারি। এক, জড় জগতের প্রকৃতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শারীর প্রকৃতির ও তন্নিবন্ধন মানস প্রকৃতির পরিবর্ত্তন। অপর জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য অথবা স্বেচ্ছাচারিতার জন্য পরাধীনতা প্রভৃতি ব্যক্তিগত অবস্থার পরিবর্ত্তন। সত্য ত্রেতাদি যুগের লোক অপেক্ষা আমাদের শরীর দুর্ব্বল; তিন সপ্তাহ উপবাস করিলে তাঁহাদের কিছুই হইত না, কিন্তু একদিন উপবাস করিলে আমরা মরিয়া যাই; যে যে উপকরণে তাঁহাদের আত্মজ্ঞানাদি ধর্ম্মের বিকাশ হইত, সেই সেই উপকরণে আমা-দের আত্মজ্ঞানাদির বিকাশ হয় না, ইত্যাদি প্রথম প্রকার পরিবর্ত্তনের উদাহরণ। * পূর্ব্বে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া

* ভৌতিক প্রকৃতি যে অনুক্ষণ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, ইহা বিজ্ঞানবিদ্ মাত্রেই অবগত আছেন। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে স্থানের ভৌতিক প্রকৃতি যেমন ছিল, এক্ষণে সে স্থানের সে প্রকৃতি আর সেরূপ নাই। পুরাণাদিতে আমাদের দেশের বৎসর বর্ণনা যেমন দেখা যায়, এখনকার সহিত তাহার সকল অংশের ঐক্য হয় না। পূর্ব্বে ষড় ঋতু যেমন সমভাবে উদিত হইত, এখন আর তেমন হয় না। পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে তাপের পরিমাণ অধিক হইয়াছে, তাহা বোধহয় অনেকেই অবগত আছেন।

ব্রাহ্মণের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত, এক্ষণে আপিসে কেরাণিগিরী না করিলে, তাঁহার জীবিকা চলে না, ইত্যাদি দ্বিতীয় প্রকার পরিবর্ত্তনের উদাহরণ। প্রথম প্রকার পরিবর্ত্তন প্রকৃতির নিয়মে ঘটিয়া থাকে, উহা নিবারণ করা মনুষ্যের অসাধ্য; দ্বিতীয় প্রকার পরিবর্ত্তনের দাস হওয়া অল্প অধিক পরিমাণে আমাদের ইচ্ছা সাপেক্ষ। যে জীবনোপায়ে অধর্ম্ম সঞ্চিত হয়, বা যাহা ধর্ম্ম সঞ্চয়ের পথে বাধা দেয়, তাহা অবলম্বন করা না করা,—আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

আমরা প্রথম প্রকার পরিবর্ত্তনের অর্থাৎ জাগতিক প্রকৃতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শারীর প্রকৃতির ও তন্নিবন্ধন মানস প্রকৃতির পরিবর্ত্তনের কথা বলিব। এস্থলে প্রকৃতির পরিবর্ত্তন কথায় কেহ বুঝিবেন না যে, মনুষ্য-প্রকৃতি একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া রূপান্তর গ্রহণ করিতেছে। জাগতিক প্রকৃতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্য-প্রকৃতির যে পরিবর্ত্তন হয়, তাহা প্রথমত মনুষ্যের শরীরের উপর দিয়া। বলের হ্রাস বৃদ্ধি, শীতোষ্ণাদি সহ্য করিবার শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি ইত্যাদি—এই পরিবর্ত্তনের অন্তর্ভূত; নহিলে মনুষ্যের কোন মূল প্রকৃতির, যাহা লইয়া মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, তাহার পরিবর্ত্তন হয় না। মানুষ সেই মানুষই আছে, হয়ত পূর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল; শীতোষ্ণাদির কষ্ট, কি উপবাসজনিত কষ্ট, হয়ত পূর্ব্বের মত সহ্য করিতে পারে না। ফল এই হইয়াছে, পূর্ব্বে যে সমস্ত ক্রিয়ায় ও যে সমস্ত উপকরণে অধিকাংশ মনুষ্যের চিত্তসংযম

ও ধৃতি-সংস্থান হইত, এক্ষণে সে সমস্ত ক্রিয়া ও সে সমস্ত উপকরণ-সংহৃতি অধিকাংশ মনুষ্যের অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

একটু প্রণিধান করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, মানব-প্রকৃতির এইরূপ অপ্রতিবিধেয় পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কেবল ধর্ম্ম-সঞ্চয়ের উপকরণ অথবা উপায় পরিবর্ত্তিত হয় মাত্র। মূল প্রকৃতি কখন বদলায় না। মানবের ধর্ম্মও কখন বদলায় না। সেই ধৃতি ক্ষমাদি যাহা সত্যযুগের ধর্ম্ম ছিল, সেই ধৃতি-ক্ষমাদি এখনকারও ধর্ম্ম। যে আত্মজ্ঞান তখনও সর্ব্বদা অন্বে-ষণীয় ছিল, এখনও তাহা আছে, তবে উপকরণের ইতরবিশেষ হইয়াছে মাত্র। এই উপকরণ বা উপায় ভেদে যে উপাসনা প্রণালীর ভেদ আছে, আমরা শাস্ত্রে তাহা দেখিতে পাই। এই জন্যই শাস্ত্র উপাসনার পাঁচ প্রকার উপায় নির্ণয় করিয়াছেন।

যাহা বলা হইল তাহাতে বুঝা গেল, জাগতিক প্রকৃতির ও তন্নিবন্ধন মানস প্রকৃতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাধনার প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়াছে মাত্র, ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হয় নাই। যে আত্মজ্ঞান সত্যযুগের ধর্ম্ম ছিল, যে মুক্তি সত্যযুগেও বাঞ্ছনীয় ছিল, সে আত্মজ্ঞান কলিযুগেরও ধর্ম্ম আছে, সে মুক্তি কলি-যুগেও প্রার্থনীয়। ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনীয় নহে, কিন্তু ধর্ম্ম-সাধনের উপায় ও উপকরণ পরিবর্ত্তনীয় বটে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ভারতবর্ষ কর্ম্মভূমি—অন্যান্য দেশ ভোগভূমি।

স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রে নানাভাবে বলা হইয়াছে যে, এই ভারতবর্ষ কর্ম্মভূমি—অন্যান্য দেশ সকল ভোগভূমি। কর্ম্ম এবং কর্ম্মের জন্য ফলভোগ—এই দুয়ের মধ্যে যদি কার্য্যকারণ সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে, একদেশে কর্ম্ম হইবে, অন্যদেশে তাহার ফলভোগ হইবে, এমন কথা ত শাস্ত্রে নাই। অমুক ঋষি পূর্ব্বজন্মে এই ভারতবর্ষেরই অমুক গ্রামে অমুক ব্রাহ্মণের সন্তান ছিলেন, এমন কথা ত শাস্ত্র-কাহিনীতে শত শত রহিয়াছে; সুতরাং ভারতবর্ষে কর্ম্ম করিয়া জন্মান্তরে, দেশান্তরেই তাহার ভোগ হয়, এমন কথা হইতেই পারে না। এ দেশের লোক যেমন কর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে আবার নূতন কর্ম্মকরে, অন্যান্য দেশের লোকও সেই রূপই করিয়া থাকে,—তবে শাস্ত্রে ওরূপ একটা ভাগ বাটোয়ারার কথা কেন বলিয়াছেন?

শাস্ত্রোক্তির গূঢ় তাৎপর্য্য, বোধ হয়, এইরূপ—এদেশের লোক ভোগ করে বটে কিন্তু সে ভোগও কেবল ধর্ম্মের জন্য, অন্যান্য দেশের লোক কর্ম্মকরে বটে কিন্তু তাহাও ভোগের জন্য। এই কথাটি যদি আমরা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি এবং শাস্ত্রের উপদেশ মত কার্য্য করিবার চেষ্টা করি, তাহা

হইলেই আমরা এই পুণ্য ভূমিতে বাস করিবার অধিকারী; নতুবা ডিক্রুস্, গোমেস্ বা ব্রাউন্, স্মিথ—চট্টগ্রাম, চুণাগলি প্রভৃতি স্থলে যে অধিকারে বাস করিতেছেন, আমাদের অধিকার তাঁহাদেরই মত।

যদি তুমি গৃহস্থ হও এবং অতিথি, দেবতা, পিতৃপুরুষ প্রভৃতিকে নিয়মিতরূপ অন্নজলাদি দান না কর, তবে তুমি নিরামিষ হবিষ্যান্নই ভোজন কর, আর পিষ্টক পলান্নই গ্রহণ কর, সে কেবল শূকর-পেট-পূরণ। তোমার আশ্রম পবিত্র পুণ্য তীর্থে হইলেও বাস্তবিকই তুমি ভারতবাসী নহ, এদেশে বাস করিবার তোমার অধিকার নাই।

তবে কি কেবল সৎপ্রবৃত্তিসম্পন্ন সাধু লোকই ভারতবর্ষে বাস করিবার অধিকারী? না, তাহা নহে। সকল প্রকার লোকেই এই দেশে চিরকাল আছে ও থাকিবে, তবে সকলকেই কর্ম্মকে প্রধান বলিয়া মানিতে হইবে। আমি রাজসিক ভাবাপন্ন লোক মণি, মুক্তা, হীরা, জহরৎ জড়িত হইতে আমার বড় ইচ্ছা। আমি কি কামস্কাটকায় বাস করিব? না তাহা করিতে হইবে না। আমি জ্যোতির্ব্বিদ্ প্রভৃতি পণ্ডিত গণের পরামর্শ লইয়া যে সকল রত্ন আমার উপযোগী, যে সকল ধাতু আমার শরীরস্থ বিষনাশক, সেই সকল ভূরি পরিমাণে ধারণ করিতে পারি। তাহাতে আমার সৎকর্ম্মই করা হইবে, আর সঙ্গে সঙ্গে মণিমাণিক্যের উপভোগ হইবে। এইরূপ সকল কার্য্যেই ভোগটাকে আনুসঙ্গিক

ব্যাপার করিতে হইবে। যিনি ভোগকে প্রাধান্য দিবেন, তিনি কর্ম্মভূমিতে বাসের অধিকারী নহেন।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে হরপার্ব্বতী কর্ত্তৃক গ্রন্থ সূচনা হইতেছে। গৌরী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভাল, যাহারা সৎপ্রবৃত্তিসম্পন্ন, তাহাদের ক্রমেই যেমন সদ্‌গতি হইবে, যাহারা অসৎপ্রবৃত্তি সম্পন্ন, তাহাদের ত তবে ক্রমেই অসদ্ গতি হইবে,তাহা হইলে তাহাদের আর নিস্তারের কোন পন্থাই কি নাই ?' মহাদেব বলিলেন, 'তা নয়—অসৎ প্রবৃত্তিসম্পন্ন লোকে,যদি কোন কর্ম্মের অর্থাৎ ধর্ম্মের উদ্দেশে তাহাদের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে, তবে তাহাদের তাহাতেই ক্রমে সদ্‌গতি হইবে। যদি জীব ভোগেচ্ছা না করিয়া, কর্ম্মেচ্ছু হইয়া, সাধনার উপায় স্বরূপ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া, মদ্যপান করে, অথবা মাংস ভক্ষণ করে বা অন্য কিছু করে, তবে তাহাতেই তাহার প্রবৃত্তির ক্রমে নিবৃত্তি হইবে এবং তাহার সদ্‌গতি হইবে।'

তবেই স্থূলকথা এই দাঁড়াইল যে, ভারতবাসী ঋষি-তপস্বীকেও যেমন ভোগেচ্ছা খাট করিতে হইবে, ভারতবাসী লম্পট মাতালকেও সেইভাবে ভোগেচ্ছা নিয়মিত করিতে হইবে। কর্ম্মের জন্য অর্থাৎ ধর্ম্মের জন্য কার্য্য করিব, সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীপুত্রের সঙ্গ-ঘটিত ভোগ আসিল, বেশ,—স্বর্ণ, মুক্তা, হীরা, জহরৎ আসিল—সোভি বেশ,—দুগ্ধ, ক্ষীর, নবনীত আসিল—সোভি বহুৎ আচ্ছা। কর্ম্মের অনুসঙ্গরূপে ঐ সকল ভোগের কোন নিষেধই নাই।

ভোগে সংযম—আমিষ বর্জ্জন।

মাংসাহার সম্বন্ধে বিধি-নিষেধের বিচার লক্ষ্য করিলেই আমাদের কথাগুলি, বোধকরি, আরও স্পষ্টীকৃত হইবে ঃ—

মনুষ্যের পক্ষে মাংসাহার করা উচিত কিনা, এ বিষয়ে তর্ক চিরদিনই আছে। বৈজ্ঞানিক প্রবর কোমৎ বলেন, যাহাতে শরীরের পুষ্টি হয়, সেইরূপ খাদ্য গ্রহণ করাই আমাদের কর্ত্তব্য; কেবল জিহ্বার শিরা বিশেষের তৃপ্তির জন্য কোনরূপ খাদ্য গ্রহণ করা অকর্ত্তব্য। ইহাকেই বলে কেবল বিজ্ঞানের দিক্ দেখা।

ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তামধ্যে মহর্ষি মনু সুপ্রসিদ্ধ; ধর্ম্মের দিকে তাঁহার দৃষ্টি প্রখরা, অথচ বিজ্ঞানেও তাঁহার অবহেলা নাই। মাংসাহার সম্বন্ধে তিনি আচার ও বিজ্ঞানের পরামর্শ লইয়া এটি খাবে, এটি খাবে না, এই ভাবে মত দিয়াছেন; এইগুলি বৈধ, এইগুলি অবৈধ বলিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার শেষ মীমাংসা শুনুন,—

"যোঽহিংসকানি ভূতানি হিনস্ত্যাত্মসুখেচ্ছয়া।
স জীবংশ্চ মৃতশ্চৈব ন কচিৎ সুখমেধতে॥" মনু ৫। ৪৫।

যে অহিংসক জীবকে আত্মসুখের ইচ্ছায় হনন করে, সে কি জীবন্তে, আর কি মৃত্যুর পর, ইহকালে পরকালে, কখনই সুখ পায় না। কিন্তু,—

"যো বন্ধনবধক্লেশান্ প্রাণিনাং ন চিকীর্ষতি॥"
স সর্ব্বস্য হিতেপ্রপ্সুঃ সুখমত্যন্তমশ্নুতে॥" মনু ৫। ৪৬।

যে প্রাণীদিগকে বধবন্ধনের ক্লেশদিতে ইচ্ছা করে না, সেই সর্ব্বহিতাভিলাষী ব্যক্তি অত্যন্ত সুখভোগ করে।

এখন কথা হইতে পারে যে, এই যে কথা ইহার কি কোন যুক্তি নাই? বিজ্ঞানেরই যুক্তি আছে, ধর্ম্মের কি কিছু যুক্তি নাই? আছে বৈকি।

"নাকৃত্বা প্রাণিনাং হিংসাং মাংসমুৎপদ্যতে ক্বচিৎ।
নচ প্রাণিবধঃ স্বর্গ্যস্তস্মান্মাংসং বিবর্জয়েৎ॥" ৫। ৪৮।

প্রাণিহিংসা না করিলে কখনই মাংস পাওয়া যায় না, প্রাণিবধ কাজটা কিছু ভাল কাজ নহে, সুতরাং মাংস ত্যাগ করাই ভাল।

তার্কিকে এই স্থলে বলিতে পারেন যে, ও আবার কি কথা হইল? 'প্রাণিবধ কাজটা ভাল কাজ নয়' সে আবার কেমন কথা হইল? এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরপক্ষ স্বরূপে মনু পরের শ্লোকে বলিতেছেন,—

"সমুৎপত্তিঞ্চ মাংসস্য বধবন্ধৌ চ দেহিনাম্।
প্রসমীক্ষ্য নিবর্ত্ততে সর্ব্বমাংসস্য ভক্ষণাৎ॥"

জীবের শুক্রশোণিতে মাংসের উৎপত্তির কথাটা এবং প্রাণীগুলিকে বন্ধন ও বধ করিবার ক্লেশের কথাটা বেশ করিয়া বুঝিয়া, সকল প্রকার মাংসভক্ষণ হইতে নিবৃত্ত হইতে হয়।

অতএব মীমাংসা হইল যে,

"প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।" মনু ৫। ৫৬।

জীবগণের মাংসাহারাদি প্রবৃত্তির নিবৃত্তিতেই মহাফল। এইটি হইল ধর্ম্মের কথা। বিজ্ঞান আজ বলিতেছে, গ্লুটেন-প্রধান খাদ্য ভাল, কাল বলিতেছে, ষ্টার্চপ্রধান খাদ্য ভাল, বিজ্ঞান বা ইতিহাসের ভিত্তির উপর যে সকল ধর্ম্মমত প্রচলিত আছে, তাহার এটিতে বলিতেছে শূকরমাংস নিষিদ্ধ, ওটিতে বলিতেছে কুক্কুটমাংস অভক্ষ্য ; কিন্তু ধর্ম্মের যে কথা —'নিবৃত্তিস্তু মহাফলা,' সে কথা সকল স্থানেই সমানভাবে আছে। অর্থাৎ ধর্ম্মের টান, একটানা, একই দিকে চলিয়াছে ; পদার্থবিজ্ঞানে জোয়ার ভাটা আছে। বলিয়াছি আমাদের ধর্ম্মের পন্থা—সনাতনী।

হিন্দুর এই নিবৃত্তিস্তু মহাফলা, এবং জিনাচার্য্যগণের আমিষ পরিবর্জন, বহুকাল হইতেই ভারতবর্ষে একটানার মত চলিতেছিল। তাহার পর আজি প্রায় আড়াই হাজার বৎসর হইল, এই ভারতে অহিংসা-পরম-ধর্ম্মের বান নামে, সমগ্র দেশ প্লাবিত করে। তাহার ফল আমরা চোখের উপর দেখিতে পাইতেছি। ভারতের জৈন, বৌদ্ধ, হিন্দুর মধ্যে বার আনা লোক মৎস্য-মাংস গ্রহণ করে না। নদীপ্রধান বঙ্গভূভাগে, সাধারণ লোকে মাছ ত্যাগ করিতে না পারিলেও মাংসাহার নাই বলিলেও হয়। বড়ই ক্ষোভের বিষয় ভারতের এ গৌরব, এখনকার দিনে কাহারও চোখে পড়ে না !

য়ুরোপের ব্যবহার শাস্ত্রের মূলনীতি এই যে, অন্যের ভোগে কোনরূপ ব্যাঘাত উৎপাদন না করিয়া, তুমি তোমার

নিজস্বই হউক, আর সাধারণস্বই হউক, যে কোন বিষয়, যে কোন ভাবে, উপভোগ করিতে পার। এই নীতির দোষগুণ যাহাই থাকুক, ইহার মূলে ভোগ এবং ফলে ভোগ—তাহার সন্দেহ নাই। বৃদ্ধ পাদরিসাহেব বলেন বটে—সংসার অনিত্য, ভোগ অসার, কিন্তু তাঁহার চেরেট জুড়িগাড়ী এবং তাঁহার বৃদ্ধা মেম সাহেবের বিনোদিয়া বনেটের পার্শ্বে কৃত্রিম কুসুম-কলাপ দেখিলে তিনি যে ভোগ-লক্ষ্য জীব তাহাই মনে হয়। এই অনাথ আতুরকে অন্নদান য়ুরোপভূমিতে হইতেছে না কি ? হইতেছে ; খুবই হইতেছে,—কিন্তু আমাদের দেশ হইতে প্রকরণ-পদ্ধতি অনেকটা বিভিন্ন। তথাকার নিয়ম এইরূপ—আমি মাসে এক টাকাই দিই, আর সহস্র টাকাই দিই,—আমি সেই টাকা পাঠাইয়া দিব, কোন আম্‌হাউসে, কোন পূয়র ফণ্ডে, কোন চ্যারিটি সোসাইটিতে—সেখানে গরীব দুঃখী অন্ন পায়, আচ্ছাদন পায়, আশ্রয় পায়। তা বলিয়া কি তাহারা আমার বাড়ী আসিয়া আমাকে 'হা অন্ন ! হা বস্ত্র !' বলিয়া বিরক্ত করিবে ? তাহা হইলে ত আমার ভোগে ব্যাঘাত হইল, আমি ভোগ-জীবন জীব আমার সর্ব্বনাশ হইল ! না, তাহা হইবে না ; আমি দান করিব সত্য, তাহাতে দরিদ্রের দুঃখ দূর হইবে তাহাও ঠিক, কিন্তু আমার ভোগে যেন ঘুণাক্ষরেও ব্যাঘাত না হয়।

আর শ্রাদ্ধের পর আমরা পিতৃলোকের নিকট কিরূপ বর প্রার্থনা করি, তাহা স্মরণ করুন,—

"দাতারো নোঽভিবৰ্দ্ধন্তাম্ বেদাঃ সন্ততিরেব চ।
শ্রদ্ধা চ নো মাব্যগমৎ বহুদেয়ঞ্চ নোঽস্তিতি ॥" মনু ৩। ২৫৯।

"হে পিতৃগণ! আমাদের কুলে যেন দাতা লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও যাগাদির অনুষ্ঠান দ্বারা বেদ শাস্ত্রের যেন সম্যক্ আলোচনা হয়; আমাদের পুত্রপৌত্রাদি বংশপরম্পরা যেন চিরকাল বিস্তৃত থাকে; বেদের উপর অটল শ্রদ্ধা যেন আমাদের কুল হইতে তিরোহিত না হয়; এবং দান করিবার জন্য দেয় দ্রব্যেরও যেন কখন অসদ্ভাব না থাকে।" (শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্নের অনুবাদ)।

ইহার মধ্যে লক্ষ্য করিতে হইবে, বংশে দাতার সংখ্যা বৃদ্ধি হউক এবং দান করিবার জন্য দেয় দ্রব্যেরও যেন কখন অসদ্ভাব না হয়। ভোগের কোন কথারই আভাস মাত্র নাই।

অথচ সকল দিকেই দেখাযায় যে, য়ুরোপের লক্ষ্যই যেন কেবল ভোগের উপর। এমন কি ভগবানের নিকট, ভক্তের যে ঐকান্তিকী প্রার্থনা,—তাহাতেও যেন ভোগের গন্ধ মাখান রহিয়াছে বোধ হয়। 'ভগবান আমার নিত্য প্রয়োজনীয় অন্ন আমাকে দাও,' অর্থাৎ আমার নিত্য ভোগের যেন ব্যাঘাত না হয়। যাহাদের জীবনের লক্ষ্যই ভোগ, তাহারা ভগবানের কাছে যে সরলভাবে তাহাই বলে, সে কথা ভাল।

ভাল হউক, মন্দ হউক, বিদেশীয় কোন নীতির বা শাস্ত্রের ভাল মন্দ দেখাইবার জন্য আমরা লিখিতেছি না। আমাদের শাস্ত্রে বারম্বার বলা হইয়াছে যে, ভারতভূমি কর্ম্মভূমি, অন্যান্য

ভূমি ভোগভূমি ; এই কথাটা বুঝিবার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া, আমরা যে ভোগভূমির আচার ব্যবহার অনুকরণ করিতে যাই—সেটা আমাদের দারুণ ভুল। এই ভুলে আমরা যে ভুগিতে বসিয়াছি, তাহাই বলিতেছি।

চারিদিকে চাহিয়া দেখুন, ভোগ বৃদ্ধির জন্য ইংরাজিওয়ালা উপার্জ্জনে ব্যস্ত। স্বীকার করি দুর্দ্দমনীয় অর্জ্জনস্পৃহার বলে ইংরাজ আজি ইংরাজ হইয়াছে। তাহারা,—ভোগভূমির লোক—তাহাদের শাস্ত্র, ভোগশাস্ত্র। কিন্তু তুমি কর্ম্মভূমির লোক, তুমি ভোগের জন্য লালায়িত হইয়া কিঞ্চিৎ মাত্রও সফল হইয়াছ কি ? তুমি যে ভোগ বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছ বাস্তবিকই তোমার ভোগের বৃদ্ধি হইয়াছে কি ? না কেবল অজীর্ণ, মাথাঘোরা, বহুমূত্র, শ্বাস কাস, অকাল মৃত্যুই বাড়িতেছে ? সভাতেই দেখি, আর সমিতিতেই দেখি, কাছারিতেই যাই, আর কুঠীতেই যাই, তোমার বাড়ীতেই হউক, আর রেল গাড়ীতেই হউক—সর্ব্বত্রই ত তোমার মুখে কেবল দুঃখের দোহাই। ঐ রাজা মহারাজা দুর্গাচরণ, যতীন্দ্র মোহন হইতে আর ঐ ক্ষুদিরাম, কুঁড়রাম কেরাণী পর্য্যন্ত—সেই একই কথা—ভাল ক্ষুধা হয় না, ভাল নিদ্রা হয় না, ভাবিতে গেলে মাথা ঘোরে, চলিতে পা টলে, শক্তি নাই, স্পৃহা নাই। ভাই, এইরূপে, এই মূর্ত্তিতে, তুমি কি তোমার ভোগ বৃদ্ধি করিবে ? একটু একটু বুঝিতেছ না কি যে, এ কর্ম্মভূমিকে তুমি কিছুতেই ভোগভূমিতে পরিণত করিতে পারিবে না।

বহু পুণ্যে এই কর্ম্মভূমিতে জন্মলাভ হয়। কর্ম্মেই আমাদের জন্মের সফলতা হইবে। অথচ কর্ম্মে, ভোগের ব্যাঘাত হয় না। প্রত্যুত কর্ম্মের অনুসঙ্গ ভোগ থাকিলে, ভোগের মলামাটি ধুইয়া যায়—ভোগ কর্ম্মেই পরিণত হয়। এই এত কট্‌কিনায়, এত ব্যবস্থায় দুমুঠা অন্ন পরিপাক করিতে পারিতেছ না,—ভাল, কিছুদিন নিয়মিতরূপে অতিথি ব্রাহ্মণের সৎকার করিয়া, দেবতা পিতৃপুরুষের পূজা করিয়া, অন্ন গ্রহণ করিয়া দেখ দেখি, সেই অন্ন কেমন সুখদ সুপথ্য হইবে—আজি যাহা শূকর-পেটের পূরণ বলিয়া মনে হইতেছে, তাহাই আবার তখন পঞ্চযজ্ঞের পূর্ণাহুতি বলিয়া জ্ঞান হইবে। তাই বলি, কর্ম্মকে বিকৃত করিয়া ভোগে পরিণত না করিয়া, ভোগকে কর্ম্মের অনুসঙ্গ করিয়া কর্ম্মে পরিণত কর। আপনা আপনি বুঝ যে, কি করিলে আমরা এই কর্ম্মভূমিতে বাস করিবার সত্য সত্যই প্রকৃত অধিকারী হইব।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কেহ কাহারও প্রশংসা করিতে হইলে বলিত, “লোকটা দাতা ভোক্তা” অগ্রে দাতা তাহার পর ভোক্তা; বাস্তবিক হিন্দুয়ানি বুঝিলে, দানই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভোগ বলিয়া মনে হয়। আবার শাস্ত্রমতে কলিকালে, দানই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। সুতরাং দানের দ্বারা ভোগের সার্থকতা করিতে যদি আমরা অভ্যাস করি, তাহা হইলে ভোগের সাধনে ধর্ম্মের সাধন হয়।

———

নবম পরিচ্ছেদ।

সত্য অহিংসাদি—নিত্যধর্ম্ম।

"যমান্ সেবেত সততং ন নিত্যং নিয়মান্ বুধঃ।
যমান্ পতত্যকুর্ব্বণো নিয়মান্ কেবলান্ ভজন্॥" মনু ৪।২০৪।

পণ্ডিতলোকে সতত যম পালন করিবে, নিয়মের সেবা নিত্য করণীয় নহে। যমপালন না করিয়া, কেবল নিয়ম ভজন করিলে পতিত হইতে হয়।

এইটি হইল মনুর শাস্ত্র সুতরাং শাস্ত্রবাদী মাত্রেই ঐ উপদেশবিধিমত কার্য্য করিতে বাধ্য। এখন কথাটা বুঝিতে হইতেছে। নিয়মানুষ্ঠানের অপেক্ষা যমানুষ্ঠানের মনু গৌরব করিতেছেন। দেখা যাউক যম নিয়ম কাহাকে বলে। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,—

"ব্রহ্মচর্য্যং দয়াক্ষান্তির্ধ্যানং সত্যমকল্কতা।
অহিংসাস্তেয়মাধুর্য্যেদমশ্চেতি যমাঃ স্মৃতাঃ॥"

ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, ক্ষমা, ধ্যান, সত্য কথন, সরলতা, অহিংসা অস্তেয়, মাধুর্য্য, দম—এইগুলি যম। আর—

"স্নানং মৌনোপবাসেজ্যা স্বাধ্যায়োপস্থনিগ্রহাঃ।
নিয়মো গুরুশুশ্রূষা শৌচাক্রোধা প্রমাদতা॥"

স্নান, মৌনাবলম্বন, উপবাস, যজ্ঞকার্য্য, বেদাধ্যয়ন, ইন্দ্রিয় সংযমন, গুরুশুশ্রূষা, শৌচ, অক্রোধ এবং সাবধানতা —এইগুলি নিয়ম।

যমনিয়মের লক্ষণ ও বিভেদ বিচারে অনেক সূক্ষ্ম তর্ক হইতে পারে, সে সকল ছাড়িয়া দিয়া এখন মোটামুটি এই বুঝিতে পারা যায় যে, হিংসা না করা, চুরি না করা, মিথ্যা না বলা, কপট ব্যবহার না করা, কেহ দোষ করিলে দণ্ড না দেওয়া বা দাদ না তোলা, রূঢ় বাক্য না বলা, ভোগেচ্ছায় কোন কার্য্য না করা—এই সকল সংযমের কার্য্য এবং জীবে দয়া ও ভগবানে ভাবনা—মানবের অবশ্য করণীয় নিত্য কার্য্য। এইগুলির পালন সকল সময়ে, সকল অবস্থায় করিতেই হইবে; ইহাতে তিথিনক্ষত্রে বাধা পড়ে না, বর্ষায় বা বসন্তে, প্রাতে বা সন্ধ্যায় করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই, মাসান্তে বা পক্ষান্তে করিতে হইবে না, এমনও কোন কথা নাই।

আর স্নান করা, মৌনব্রত করা, যজ্ঞ করা, বেদপাঠ করা, উপস্থ নিগ্রহ করা, গুরুসেবা করা, অন্তর্ধৌতি ও বহির্ধৌতি করা, ক্রোধ পরিবর্জ্জন এবং সাবধানতা—এই সকল নিয়ম-পূর্ব্বক করিতে হয়। স্নান, উপবাস, ব্রত, যজ্ঞ, এ সকল কি সমস্ত রাত্রি দিনই করিবে? না অসুস্থ হইলে করিবে? এ সকল কোন্ কোন্ সময়ে করিতে হইবে, তাহার বিধি আছে, আর কোন্ কোন্ সময়ে করিতে হইবে না, তাহার নিষেধও

আছে। এই জন্যই ভগবান্ মনু বলিয়াছেন যমানুষ্ঠান সতত করিবে, নিয়মানুষ্ঠান নিত্য করণীয় নহে।

মনুর বাকি কথাটুকু—যম না করিয়া, কেবল নিয়ম ভজন করিলে (মানবের) পতন হয়—এইটুকু গাঢ় উপদেশপূর্ণ,শাস্ত্রমুখে বিজ্ঞানবার্ত্তা এবং এ সময়ে সকলেরই মনে রাখা কর্ত্তব্য।

দিব্য প্রাতঃস্নান করিয়া ফোঁটা কাটিয়া, গরদের জোড় পরণে স্তব উচ্চারণ করিতে করিতে বাড়ী আসিয়া, পূজা, হোম, তর্পণাদির অনুষ্ঠান করিলাম, কিন্তু তাহার পর সমস্ত দিন কেবল মিথ্যাচার আর কপটাচার, ভণ্ডামি; লোকের বাপান্ত, আর আহারের লোভান্ত,—এইরূপ নিয়ম করিয়া যদি লোকের পতন না হয়, তাহা হইলে শাস্ত্র মিথ্যা, বিজ্ঞান মিথ্যা—সকলই মিথ্যা। যমানুষ্ঠান না করিয়া কেবল নিয়মভজন করিলে, মানবের পতন হয়—তাহাতে কি সন্দেহ আছে? চারিদিকেই এই বিজ্ঞান-বার্ত্তার জ্বলন্ত প্রমাণ রহিয়াছে।

কোনগুলি যম আর কোনগুলি নিয়ম, এতদ্বিষয় নির্দ্দেশে শাস্ত্রকারগণমধ্যে সামান্য মতভেদ থাকিলেও যম নিয়মের প্রকৃতিভেদ বেশ বুঝিতে পারা যায়। কেহ কেহ বলেন যে, পাঁচটি মাত্র যম,—সেগুলি এই ঃ—

> "অহিংসা সত্যবচনং ব্রহ্মচর্য্যমকল্কতা।
> অস্তেয়মিতি পঞ্চৈতে যমা বৈ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥"

মহর্ষি পতঞ্জলিও বলেন, যম পাঁচটি আর সেগুলি এই ঃ—

"অহিংসা সত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যা পরিগ্রহাযমাঃ।"

এইরূপ যত মতভেদ থাকুক—হিংসা না করা, মিথ্যা না বলা, পরস্বাপহরণ না করা, আর ভোগসাধন ত্যাগ করা, এই কয়েকটি বিষয় যে যম, তাহা স্থির আছে।

এখন এস দেখি! ভাই সকল, দাদা সকল, বাপ সকল, আমরা সকলে কায়মনোবাক্যে ঐ চারিটি যমানুষ্ঠানের চেষ্টা করি। ভারতোদ্ধার, বঙ্গোদ্ধার যথেষ্টই হইয়াছে; এখন এস দেখি, দিন কত আমরা আপনা আপনি আত্মোদ্ধারের চেষ্টা করি; আমি যদি ক্রমেই পতিত হইতে থাকি, তাহা হইলে আমার দ্বারা কোন কিছু উদ্ধারের সম্ভাবনা আছে কি? তা কখনই নাই। আমাদের দ্বারা দেশোদ্ধারের চেষ্টা একদিকে ভণ্ডামি, অন্যদিকে পাগলামি। আমাদিগের এই অধঃপতনের অবস্থা হইতে, কোনরূপে যদি আমরা উদ্ধার পাই, তবেই আমাদের রক্ষা, নতুবা আমাদের সদ্‌গতি অসম্ভব।

তবে কি আমরা কেবল আত্মস্বার্থের দিকেই দেখিব, কিসে আপনি রক্ষা পাই, তাহাই ভাবিব? অন্যের বিষয় কি কিছুই ভাবিব না? না, তা কেন? আমরা আপনারা যমানুষ্ঠানের চেষ্টা করিব। আমাদের সন্তানসন্ততিগণ যাহাতে ঐরূপ অনুষ্ঠানে রত হন, পোষ্যবর্গের মধ্যে অনুগত ব্যক্তিরা যাহাতে ঐরূপ করেন এবং যদি আমাদের প্রকৃত শিষ্য সেবক কেহ থাকেন, তবে তাঁহারাও যাহাতে অহিংসাদি ধর্ম্ম পালন করেন, সে বিষয়েও কায়মনোবাক্যে, দৃষ্টান্ত উপদেশাদি দ্বারা চেষ্টা করিব। যদি মরণকালে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, আমি

নিয়ত যমানুষ্ঠানের চেষ্টা করিয়াছি, অনেক সময় কৃতকার্য্য হইয়াছি—আর পাঁচটি যুবা পুরুষকে সেইরূপ অনুষ্ঠানে রত রাখিয়া চলিলাম—তবে কি সুখের মৃত্যুই না হইবে!

কার্য্যত যতই কেন বিপরীতাচরণ করি না কেন, হিংসা করা, মিথ্যা বলা, পরস্বাপহরণ করা যে অধর্ম্ম তাহা আমরা অনেকে বুঝি, কিন্তু 'ভোগসাধন অস্বীকার' করা যে একটা ধর্ম্ম, এমন কি সকলের অবশ্য পালনীয় নিত্যধর্ম্ম—এ কথাটা আমাদের মধ্যে অনেকেরই মনে লাগে না। কাহারও কিছু ক্ষতি করিলাম না, এমন দিনে দুটা ন্যাংড়া আম খাইয়া একটু রসনার তৃপ্তিসাধন করিলাম, আর তাহাতেই পাপ হইল, এ কথাটা বুঝা আজিকার দিনে বড়ই কঠিন।

আমরা অন্যদেশের ধর্ম্মনীতির কথা বরং কিছু কিছু জানি, আমাদের সনাতন ধর্ম্মের কথা নাকি কিছুই জানি না।—তাহাতে, এই ভোগ বিষয়ে, অন্যান্য দেশের নীতির সহিত আমাদের আর্য্যভূমির নীতির সম্পূর্ণ বিরোধ,—কাজেই কথাটা বুঝা আমাদের পক্ষে বড়ই কঠিন দাঁড়াইয়াছে। অথচ বোধ হয় যে, সনাতন ধর্ম্মাচারে ঐ ভোগেচ্ছার বিরতিই—মজ্জা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রে বলেন যে, এই ভারতবর্ষ কর্ম্মভূমি, অন্যান্য দেশসকল ভোগভূমি; অর্থাৎ ভারতবাসীর পক্ষে ভোগ বাসনা নিয়তই সংযত করা কর্ত্তব্য।

ধর্ম্মশাস্ত্রে, যোগশাস্ত্রে দেখা যাইতেছে, ব্রহ্মচর্য্য যমধর্ম্মের মধ্যে এবং আমাদের নিত্য পালনীয়। এই ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা-

কালের বা আশ্রমবিশেষের পালনীয় ব্রহ্মচর্য্য নহে। ইহা সকল আশ্রমেরই সেবনীয়। যে ব্রহ্মচর্য্যে উপস্থনিগ্রহাদি কঠোর ব্রত আবশ্যক, তাহা এ ব্রহ্মচর্য্য নহে। যাজ্ঞবল্ক্যের উদ্ধৃত শ্লোকে দেখা যাইতেছে যে, উপস্থনিগ্রহ নিয়মের মধ্যে এবং তাহা ব্রত উপবাসাদির মত সময়ে সময়ে কর্ত্তব্য। অবশ্য পালনীয় ব্রহ্মচর্য্যের অর্থ বিজ্ঞান ভিক্ষু করিয়াছেন 'ব্রহ্মচর্য্যং ভোগসাধনানামস্বীকরণং'—ভোগসাধন হইতে বিরতি থাকাই ব্রহ্মচর্য্য। আর সেই ব্রহ্মচর্য্য সনাতন ধর্ম্মবাদী মাত্রেরই অবশ্য পালনীয় নিত্যকার্য্য।

এ ব্রহ্মচর্য্যে, দেবতা, অতিথি, ব্রাহ্মণকে নিবেদন করিয়া দিয়া শাস্ত্রানুগত উত্তম আহার গ্রহণ করিতে নিষেধ নাই। ঋতুকালে এবং নিষিদ্ধকাল ব্যতীত অন্য সময়ে উপযাচিত হইয়া, স্ত্রীসঙ্গমের বিধি আছে। ভোগেচ্ছা না করিয়া সকলই ভোগ করিবার ব্যবস্থা আছে।

"অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
এতৎ সামাজিকং ধর্ম্মং চাতুবর্ণেহব্রবীন্মনুঃ॥"

অন্যত্র মনু বলেন—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, এগুলি চারি বর্ণের সামাজিক ধর্ম্ম।

সকল আশ্রমীর, সকল বর্ণের যাহা সাধারণ ধর্ম্ম, অথচ অবশ্য পালনীয়, তাহাত ঐরূপই হইবে। অতি কঠোর বলিয়া যে এই ব্রহ্মচর্য্য আমরা পালন করিতে পারি না, এমন

নহে। শিক্ষাদোষে আমাদের প্রবৃত্তিগুলা হইয়াছে, নিতান্ত নোংরা,—তাহাতেই আমরা এত কষ্ট পাইতেছি। দিবারাত্রি কেবল ভাবিব—ভোগ, ভোগ, ভোগ,—সুখ, সুখ, সুখ। কাজেই আমাদের অধঃপতন চলিয়াছে। যদি পূর্ব্বের মত একবার ধর্ম্ম ধর্ম্ম বলিয়া চিন্তা করিতে পারি, তবেই এই অধঃপতন হইতে আমাদের রক্ষা হইবে।

এই যম নিয়মের কথাই বঙ্কিম বাবু প্রচারের প্রথম সংখ্যায় তাঁহার ভাষায় জীবন্তভাবে তুলিয়া ছিলেন। আমরা সেই স্থান উদ্ধৃত করিয়া পাঠকের সম্মুখে ধরিতেছি। বলিতে হইবে না, তাঁহার মতের সহিত আমাদের মতের ঐক্য নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"আচার ধর্ম্ম ? না ধর্ম্মই ধর্ম্ম ? যদি আচার ধর্ম্ম না হয়, ধর্ম্মই ধর্ম্ম হয়, তবে এই আচারভ্রষ্ট ধার্ম্মিক ব্যক্তিকেই হিন্দু বলিতে হয়" ইতিপূর্ব্বে তিনিই বলিয়াছিলেন, আমাদের ধর্ম্ম আমাদের জীবনের সমস্ত ভাগ লইয়া—সুতরাং এখন আবার আচারকে ধর্ম্ম হইতে পৃথক্ করেন কেমন করিয়া ? যাহা হউক অগ্রে বঙ্কিম বাবুর কথা-গুলি তাঁহার ভাষাতেই বলি :—

"আমরা একটি জমীদার দেখিয়াছি। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং অত্যন্ত হিন্দু। তিনি অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া কি শীত কি বর্ষা প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করেন এবং তখনই পূজাহ্নিকে বসিয়া বেলা আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত অনন্যমনে তাহাতে নিযুক্ত থাকেন। পূজাহ্নিকের কিছুমাত্র বিঘ্ন হইলে মাথায়

বজ্রাঘাত হইল, মনে করেন। তাহার পর অপরাহ্নে নিরামিষ শাকান্ন ভোজন করিয়া একাহারে থাকেন, ভোজনান্তে জমিদারী কার্য্যে বসেন। তখন কোন্ প্রজার সর্ব্বনাশ করিবেন, কোন্ অনাথা বিধবার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইবেন, কাহার ঋণ ফাঁকি দিবেন, মিথ্যা জাল করিয়া কাহাকে বিনাপরাধে জেলে দিতে হইবে, কোন্ মোকদ্দমায় কি মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করিতে হইবে, ইহাতেই তাঁহার চিত্ত নিবিষ্ট থাকে, এবং যত্ন পর্য্যাপ্ত হয়। আমরা জানি যে, এ ব্যক্তির পূজা আহ্নিকে, ক্রিয়াকর্ম্মে, দেবতা ব্রাহ্মণে আন্তরিক ভক্তি, সেখানে কপটতা কিছু নাই। জাল করিতেও হরিনাম করিয়া থাকেন। মনে করেন, এ সময় হরি-স্মরণ করিলে এ জাল করা আমার অবশ্য সার্থক হইবে। এ ব্যক্তি কি হিন্দু?

"আর একটি হিন্দুর কথা বলি। তাঁহার অভক্ষ্য প্রায় কিছুই নাই। যাহা অস্বাস্থ্যকর, তাহা ভিন্ন সকলই খান। এবং ব্রাহ্মণ হইয়া এক আধটু সুরাপান পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। যে কোন জাতির অন্ন গ্রহণ করেন। যবন ও মোল্লার সঙ্গে একত্রে ভোজনে কোন আপত্তি করেন না। সন্ধ্যা আহ্নিক ক্রিয়া কর্ম্ম কিছুই করেন না। কিন্তু কখন মিথ্যা কথা কহেন না। যদি মিথ্যা কথা কহেন, তবে মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তি স্মরণ পূর্ব্বক যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয় অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেই খানেই মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন। নিষ্কাম হইয়া দান ও পরহিতসাধন করিয়া

থাকেন। যথাসাধ্য ইন্দ্রিয়সংযম করেন এবং অন্তরে ঈশ্বরকে ভক্তি করেন। কাহাকে বঞ্চনা করেন না, কখন পরস্ব কামনা করেন না। ইন্দ্রাদি দেবতা, আকাশাদি ঈশ্বরের মূর্ত্তিস্বরূপ এবং শক্তি ও সৌন্দর্য্যের বিকাশস্বরূপ বিবেচনা করিয়া, সে সকলের মানসিক উপাসনা করেন। এবং পুরাণ-কথিত শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বগুণসম্পন্ন ঈশ্বরের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া আপনাকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত করেন। হিন্দুধর্ম্মানুসারে গুরুজনে ভক্তি, পুত্রকলত্রাদির সস্নেহে প্রতিপালন, পশুর প্রতি দয়া করিয়া থাকেন। তিনি অক্রোধ ও ক্ষমাশীল। এ ব্যক্তি কি হিন্দু? এ দুই ব্যক্তির মধ্যে কে হিন্দু? ইহাদের মধ্যে কেহই কি হিন্দু নয়? যদি না হয় তবে কেন নয়? ইহাদের মধ্যে কাহাতেও যদি হিন্দুয়ানি পাইলাম না, তবে হিন্দুধর্ম্ম কি? এক ব্যক্তি ধর্ম্মভ্রষ্ট, দ্বিতীয় ব্যক্তি আচারভ্রষ্ট। আচার ধর্ম্ম, না ধর্ম্মই ধর্ম্ম? যদি আচার ধর্ম্ম না হয়, ধর্ম্মই ধর্ম্ম হয়, তবে এই আচারভ্রষ্ট ধার্ম্মিক ব্যক্তিকেই হিন্দু বলিতে হয়। তাহাতে আপত্তি কি?”

প্রথম জমীদারের কথা,—তাহার কথাই মনু স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—‘যম ভজন না করিয়া কেবল নিয়ম পালন করিলে, (মানবের) পতন হয়।’ এরূপ জমীদারকে লোকে এখনও ঘোরতর অশ্রদ্ধা করে; তবে ‘পতিত’ জ্ঞান করিয়া তাঁহার সহিত ‘ব্যবহার’ বন্ধ করিবার শক্তি আমাদের সমাজের নাই। সেইটি নিতান্ত ক্ষোভের বিষয়। যমী ব্রাহ্মণের সংখ্যা এখন

হইতে কিছু বেশী না হইলে এ বিষয়ের প্রতীকারের সম্ভাবনা দেখা যায় না।

দ্বিতীয় বাবুর কথা,—তিনি কখন মিথ্যা কথা কহেন না, কাহাকে বঞ্চনা করেন না, পরস্ব কামনা করেন না ইত্যাদি অর্থাৎ তিনি অনেকগুলি যম পালন করিয়া থাকেন। বেশ! “কিন্তু তাঁহার অভক্ষ্য প্রায় কিছুই নাই। যাহা অস্বাস্থ্যকর তাহা ভিন্ন সকলই খান এবং ব্রাহ্মণ হইয়া এক আধটু সুরাপান পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন” ইত্যাদি। প্রথম কথা, যাহা কেবল শরীরের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর, কেবল তাহাই কি আমাদের ত্যাজ্য? আর যাহা আত্মার অকল্যাণকর, তাহা ত্যাজ্য নহে? যাহা কেবল ইহকালে অকল্যাণকর, তাহাই ত্যাজ্য, আর যাহা পরকালে অকল্যাণকর, তাহা ত্যাজ্য নহে? ইহা কিরূপ বুদ্ধি বুঝা যায় না; তবে হিন্দুর বুদ্ধি নহে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তাহার পর আবার বলি—ব্রহ্মচর্য্য যমের অন্তর্গত। সকল শ্রেণীর পক্ষেই সকল সময়েই অবশ্য পালনীয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই ব্রহ্মচর্য্য—শিক্ষাকালের বা আশ্রম বিশেষের পালনীয় ব্রহ্মচর্য্য নহে—অবশ্য পালনীয় ব্রহ্মচর্য্যের অর্থ বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন—ভোগসাধন হইতে বিরতি থাকাই ব্রহ্মচর্য্য। আর সেই ব্রহ্মচর্য্য সনাতন ধর্ম্মবাদী মাত্রেরই অবশ্য পালনীয় নিত্য কার্য্য। তা যে ব্যক্তি সর্ব্বভুক্, সুরাপায়ী—সে আর ভোগে বিরত কি প্রকারে? সুতরাং বাবুও যমী নহেন। ইঁহাকেও লোকে অশ্রদ্ধা করে, তবে পণ্ডিত

বলিয়া পরিত্যাগ করিবার ক্ষমতা, এস্থলেও সমাজের নাই। সুতরাং ঐ জমীদার শ্রেণীর আর এই বাবু শ্রেণীর সমানে 'বোল বোলাও' চলিয়াছে। ইহা নিতান্ত ক্ষোভের বিষয়।

তৃতীয় কথা—কেবল ইহকালের হিসাবে আচারের গণনা করিলেও সদাচারের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা যায়। এই কথাটা আমার বুকের ভিতর কিরূপে বসিয়া গেল, তাহা বলিতেছি। ৬৫ বৎসর বয়সে পিতৃদেবের 'পরলোক' হইয়াছে; আমি গলায় উত্তরীয়-বাঁধা ভাটপাড়ায় গিয়াছি। গ্রাম-মধ্যস্থ মন্দিরের পাশে—যেখানে ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণের প্রত্যহ বৈকালিক কমিটি বসে, সেই খানে—গিয়া উপস্থিত। দেখি ৭০, ৮০, ৯০ বৎসরের দশ পনর জন ঠাকুর সেই খানে উপবিষ্ট! বাবার ৬৫ বৎসর বয়সে মৃত্যুর শোক উথলিয়া উঠিল। সেই দ্রবহৃদয়ে কথাটা অঙ্কিত হইল। সদাচার হিন্দুকে দীর্ঘজীবী করে। বাবা যে অনাচারী ছিলেন, এমন নহে; তবে ভাটপাড়ার ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ বিশেষরূপে নিয়মসেবী এবং বিশেষরূপে সদাচারী। বুঝিলাম, তাহাতেই ইঁহাদের সবল, সুস্থ কায় ও দীর্ঘ জীবন।

হিন্দু বিধবা আমাদের সমাজে সকল শ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আচার রক্ষা ও নিয়ম পালন করেন। সকলেই জানেন,—তাঁহারা অনেকটা সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবন লাভ করেন।

অপরদিকে কদাচারের, অনাচারের ফল, আমরা হাতে হাতে দেখিতেছি;—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরলপ্রাণ

রামতনু লাহিড়ী, খ্রীষ্টানপ্রবর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি জন কয়েক ব্যক্তি ছাড়া, ইংরাজিওয়ালা প্রায় সকলেই অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া আমাদিগকে শোকসাগরে মগ্ন করিয়াছেন। হিন্দু-হিতৈষী হরিশ্চন্দ্র, বিখ্যাত ব্যবস্থাজীব দ্বারকানাথ, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, ব্রহ্মবান্ধব—কত নাম করিব ? এই সকল শোককর অকাল মৃত্যুর নানা কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু ইংরাজিওয়ালার অনাচার, কদাচার কি অন্যতম কারণ নহে ? সময় অসময় না মানিয়া আহারাদি করা, ধনার্জ্জনের জন্য বা যশের লোভে অপরিসীম পরিশ্রম করা, এ সকলকেও সদাচার বলিতে পারি না।

দশম পরিচ্ছেদ।

জাতি।

সৃষ্টি, স্থিতি, উন্নতি।

খ্রীষ্টান মিশনারিদের কৃপায় এবং অখ্রীষ্টান, অহিন্দু, অমুসলমান সম্প্রদায়ের অনুকরণের অনুষ্ঠান-গুণে, জাতিভেদে অনিষ্টপাতের কথা শুনিতে আর কাহারও বাকি নাই। জাতি-ভেদের গুণের কথাই বা কম শুনিয়াছি কি? সেই প্রাচীনের প্রাচীন, বিজ্ঞের বিজ্ঞ মনু হইতে ঐ বালকের বালক, অজ্ঞের অজ্ঞ, সদ্য উপনীত ব্রাহ্মণ-তনয় পর্য্যন্ত, জাতিভেদ পক্ষে দুটা কথা কে না বলিয়াছেন? কিন্তু এই ঘোরতর তর্ক-বিতর্কের ফল হইয়াছে কি? অন্যান্য বিষয়ে ইংরাজি শিক্ষায় সাধারণত যে ফল ফলিয়াছে, এ বিষয়েও ঠিক সেইরূপ ফল হইয়াছে; আমরা এখন ঘাড় নাড়িয়া দুই দিকেই দু চারি কথা বলিতে পারি। যে দিকে ব্রীফ্ দিবে আমরা এখন সেই দিকেই ওকালতি করিতে প্রস্তুত। আমরা চৌকশ লোক (Square man) হইতে পারি, আর নাই পারি, সমানান্তরাল লোক (Parallel man) হইয়াছি বটে। অনেক বিষয়েই আমাদের দুই দিকে সমান টান। বাল্য বিবাহ—হাঁ, দুই দিকেই আছি; বিধবা

বিবাহ—সেই রূপ; স্ত্রী-স্বাধীনতা,—তথৈবচ; জাতিভেদ—ডিটো। আমরা দুই দিকেই বলিতে কহিতে পারি, কোন দিকেই কার্য্য করিতে প্রস্তুত নহি। অবস্থার তাড়নায় যেরূপ দাঁড়ায়, সেইরূপই কার্য্য করিয়া থাকি, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সে ত বক্তৃতার বিষয়। যদি ঠাকুরমা প্রবলা হইলেন, তাহা হইলে গৃহিণী গুদামজাত, আমরা হইলাম রক্ষণশীল; যদি গৃহিণী প্রবলা হইলেন, তাহা হইলে তিনি গড়ের মাঠে, আমরা সংস্কারক। এমন করিয়া আর কতদিন চলিবে?

আসল কথা এই যে, সামাজিক ব্যাপারে আমরা গোল করিতে মজবুত বটে, কিন্তু কঠোর কর্ত্তব্য বোধে সাধ্যমত মীমাংসা করিয়া কার্য্য করিতে প্রস্তুত নহি। জাতিভেদ, জাতিভেদ আমরা সকলেই বলিয়া থাকি, কিন্তু কিসে জাতি হয়, রয়, যায়, তাহা কি আমরা বাস্তবিক বুঝি?

ইংরাজি পুস্তকে দেখা যায় যে, জাতিভেদ-দোষেই জগন্নাথের রথে যাত্রী মারা পড়ে, বালবিধবায় চির কৌমার্য্যের যন্ত্রণা ভোগ করে, পশ্চিমের ব্রাহ্মণে মৎস্য ভক্ষণ করেন না। জাতিভেদ যে কি তাহা তাঁহারা বড় বলেন না, তাঁহাদের কথাও বড় একটা বুঝা যায় না, তবে মোটের উপর এই মাত্র বুঝা যায় যে, জাতিভেদ কেবল শয়তানের শয়তানি। আবার জিজ্ঞাসা করি, এইরূপ ফাকা কথা লইয়া কতদিন চলিবে?

কোন্ বিষয়ের কতটুকু লইয়া জাতিভেদ, তাহা বুঝা আমাদের অগ্রে কর্ত্তব্য। আমরা যতদূর বুঝি তাহাতে এইমাত্র

বুঝা যায় যে, জন্মভেদেই জাতির সৃষ্টি; বিবাহের নিয়মেই ইহার স্থিতি এবং সঙ্কর বীজেই জাতকের জাতি নষ্ট।

গুণ ভেদে জাতিভেদ,—অসম্ভব কথা। আপনার গুণে সিবিলিয়ান হওয়া যায়, ইলবর্ট বিলের গুণে সমান অধিকার পাওয়া যায়, কিন্তু কোনও বিধিব্যবস্থায় বাঙ্গালি ইংরেজ হইতে পারে কি? বিশ্বামিত্র, হয় মহা তপস্যা, না হয় মহা দাঙ্গা করিয়া, অথবা দুই করিয়া, ব্রাহ্মণের অধিকার পাইয়াছিলেন। তবু তিনি রাজর্ষি হইয়াছিলেন মাত্র; এত সাধ্য-সাধনায়ও ব্রহ্মর্ষি হইতে পারেন নাই। উদার ব্যবস্থা থাকিলে, গুণ থাকিলে, একজাতি উচ্চতর জাতির অধিকার পায়, দোষী হইলে নীচতর জাতির মত কোন কোন অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। বীজশুদ্ধিতে জাতির উৎপত্তি, কেবল বীজের অশুদ্ধিতেই জাতি নষ্ট হয়। অন্য কোন দোষগুণে জাত্যন্তর প্রাপ্তির কথা অসম্ভব। বিশেষ বিশেষ কার্য্য-দোষে ব্রাহ্মণ পতিত হইলে চণ্ডালের সমান হয়, চণ্ডাল হয় না।

এই বীজশুদ্ধির জন্য বিবাহশুদ্ধির একান্ত আবশ্যক, একথা হিন্দুশাস্ত্রের সর্ব্ববাদিসম্মত। বিবাহশুদ্ধির জন্যই জাতিভেদ হইয়া থাকে। বীজশুদ্ধির জন্য অন্নশুদ্ধি আবশ্যক বটে; কিন্তু ভিন্ন বর্ণের অন্নে অন্নশুদ্ধি হয় না, এ মতটি সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী নানা শাস্ত্র হইতে প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, মহাভারতাদির সময়ে শূদ্র-সূপকারের অন্ন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় সকলেই গ্রহণ করিতেন। আসল কথা, পাক-

ভেদ জাতিভেদের মজ্জা নহে; বীজভেদই জাতিভেদ এবং সম্পূর্ণরূপে বীজশুদ্ধিই জাতিভেদের একমাত্র লক্ষ্য।

এই বীজশুদ্ধিতত্ত্ব য়ূরোপ, আমেরিকার অপরিচিত। ঐ সকল দেশ অশুদ্ধ বীজের বা মিশ্র বীজের ক্ষেত্র। য়ূরোপ বাহুবলে বলীয়ান, যন্ত্র-কৌশলে গরীয়ান, নবোৎসাহে তেজীয়ান। অশুদ্ধবীজ এত করিয়াছে, কাজেই য়ূরোপ শুদ্ধবীজের গৌরব বুঝে না। সমগ্র পৃথিবীতে কেবল দুইটি মাত্র জাতি বীজশুদ্ধির গৌরব করেন—হিন্দু ও য়ূদী। আর এই দুইটিই পরাধীন জাতি। এই কি বীজশুদ্ধির ফল হইল? ফল সামান্য নহে; যখন রোমান, য়ূনান প্রভৃতি অশুদ্ধবীজ প্রাচীন জাতিরা অতীতের অতলে লীন হইয়াছে, তখন কেবল এই দুটি শুদ্ধবীজ জাতিই, লক্ষ লাঞ্ছনেও জীবিত আছে। শুদ্ধবীজের আশ্চর্য্য জীবনীশক্তি।

য়ূরোপ এতকাল বীজশুদ্ধির ভালমন্দ কোন কথাই জানিত না বটে,কিন্তু সম্প্রতি একটু আধটু আভাস পাইতেছে। প্রথমে জাতিশক্তি (Heredity) না বুঝিলে বীজশুদ্ধি বুঝা যায় না। কিছু দিন পূর্ব্বে জন ষ্টুয়ার্ট মিল প্রমুখ মহা মহা পণ্ডিতেরা কি সমাজ নীতিতে, আর কি ব্যক্তিগত চরিত্রে, কেবল শিক্ষাশক্তিই স্বীকার করিতেন। হর্বর্ট স্পেন্সরের সহিত মিলের জাতিশক্তি লইয়া মহা তর্ক হয়; শেষে মিল জাতিশক্তি স্বীকার করেন; এখন অনেকেই জাতিশক্তি মানেন। কেহ কেহ জাতিশক্তির প্রাধান্য দিতেছেন। পুংস্ত্রীভেদের তত্ত্ব পর্য্যা-

লোচনার পুস্তকে ষ্টার্কওয়েদার জাতিশক্তির গৌরব করিয়াছেন।

"Great attention has been recently given to education; it is looked upon as a sovereign remedy for crime and many other diseases of the body politic. But probably the most urgent question of the time is this: Is not *generation* of more consequence than *education?* * * * In improving the blood of domestic animals, is the best attention given to the *training* or the *blood?*"

অন্য স্থলে ;—

"The truth is that mankind has never investigated the subject but strangely neglected what might be positively ascertained with comparative ease. If the laws of heredity were as well known as they might and should be, the knowledge of them would greatly conduce to health and length of days and to the transmission to our posterity of the higher and better elements of our nature."

The Law of Sex, by Starkweather.

মস্তক বেষ্টনে নাসিকা স্পর্শ করাই, এখনকার দিনে আমাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। সকল তত্ত্বই এখন য়ুরোপ ঘুরিয়া বুঝিতে হয়। দর্শন, যোগ প্রভৃতি শাস্ত্র আমরা সহজ পথে না শিখিয়া, য়ুরোপীয় তত্ত্বের মধ্য দিয়া বুঝিতে যাই। সুতরাং জাতিশক্তির কথা এবং বীজশুদ্ধির কথা যখন য়ুরোপে উঠিয়াছে, তখন এদেশেও উঠিবে, এমন ভরসা করা অসঙ্গত নহে।

বীজশুদ্ধি লক্ষ্য করিয়াই জাতির সৃষ্টি এবং বীজশুদ্ধিতেই জাতির স্থিতি। কিন্তু কেবল বীজশুদ্ধিতে অধঃপতিত সমাজের কোন জাতিরই উন্নতি হইতে পারে না। তজ্জন্য চিত্তশুদ্ধির সহিত ক্রিয়াশুদ্ধি একান্ত আবশ্যক।

বীজশুদ্ধির গৌরবজ্ঞান ভারতবাসীর অস্থিমজ্জায় অন্তর্নি-বিষ্ট আছে। ব্রাহ্মণ, খ্রীস্টান হইয়াও কন্যার বিবাহ দিবার সময় ব্রাহ্মণ (খ্রীস্টান) পাত্রের অনুসন্ধান করেন। সুতরাং জাতিভেদের মজ্জা রক্ষার জন্য আমাদিগকে বিশেষ ব্যস্ত হইতে হইবে না; কিন্তু চিত্তশুদ্ধি, ক্রিয়াশুদ্ধির জন্য যত্ন করা সকলের পক্ষেই একান্ত আবশ্যক।

সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণ জাতির। ব্রাহ্মণ এখনও হিন্দু সমাজের শীর্ষ স্থানীয়। ব্রাহ্মণের পুনরুত্থান সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক; ব্রাহ্মণ উঠিলে, সকলের উদ্ধার সহজ হইবে। এই বিষয়ে অগস্ত কোম্‌তের মত অতি বিচিত্র। তিনি বলেন, ব্রাহ্মণ হইতে ভারতের পুনরুদ্ধার হইবে; তবে তজ্জন্য বিষয়-বাসনা

এবং ঐহিক প্রভুত্ব-লালসা পরিত্যাগ করা ব্রাহ্মণের পক্ষে একান্ত আবশ্যক *। তাহা করিতে পারিলেই ব্রাহ্মণ জাতি আবার পূর্ব্ব গৌরব পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু য়ুরোপের সুদূর প্রান্ত হইতে কঠোর বৈজ্ঞানিক কোম্‌ত ভারতের বিকৃত ইতিহাস পাঠ করিয়া যে কথাটি বুঝিতে পারিলেন, যাঁহাদের কথা তাঁহারা, শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ সহস্র স্থানে স্পষ্ট দেখিয়াও, সেই কথা বুঝিতে পারেন না, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহাই আক্ষেপের কথা! ব্রাহ্মণ! যখন তোমার বিষয়বাসনা ছিল না, সামান্যে সন্তুষ্ট থাকিতে, শ্রদ্ধার দানে দিন যাপন করিতে, পরমার্থ চিন্তায় আনন্দ বোধ করিতে, তখন তুমি ঊর্দ্ধ হস্তে কেবল আশীর্ব্বাদ করিয়া সমগ্র সমাজের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়াছ, আর আজি তুমি বৈষয়িক বৈভবের জন্য ব্যস্ত, কাজেই আজি তোমাকে দক্ষিণার জন্য দ্বারে দ্বারে জোড় হস্তে পরিভ্রমণ করিতে হইতেছে! জানি না, কতদিনে তোমার চক্ষু উন্মীলিত হইবে।

ব্রাহ্মণগণ এখন যদি জাতি-স্থিতির ভাবনা না ভাবিয়া স্বজাতির উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন, নিঃস্বার্থ ধর্ম্ম-জীবনের উচ্চ ব্রত অবলম্বন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্ব গৌরব লাভ করেন এবং ভারতে সত্য সত্যই নবজীবন হয়। জানি না, ব্রাহ্মণের চক্ষু কবে উন্মীলিত হইবে। এমন করিয়া আর কত দিন চলিবে!

---

* Vide *Positive Polity*, *Vol. IV. P. 447.*

একাদশ পরিচ্ছেদ

জাতিভেদে ব্যবসায়-ভেদ।

জাতিভেদে ব্যবসায়-ভেদ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রবর্টসনের মত অতি সমীচীন। সেই মতটি আমরা আংশিক উদ্ধৃত করিয়া দিলাম এবং কিয়দংশের অনুবাদও এইখানে দিলাম।

"Such arbitrary arrangements of the various members which compose a community, seem, at first view, to be adverse to improvement either in science or in arts; and by forming around the different orders of men artificial barriers, which it would be impious to pass, tend to circumscribe the operations of the human mind within a narrower sphere than nature has allotted to them. When every man is at full liberty to direct his efforts towards those objects and that end which the impulse of his own mind prompts him to prefer, he may be expected to attain that high degree of eminence to which the uncontrolled exertions of genius and industry naturally conduct. The regulations of Indian polity, with respect to the different orders of men, must necessarily, at some times, check genius in its career, and confine to the functions of an inferior caste, talents fitted to shine in a higher sphere. But the arrangements of civil government are made, not for what is extraordinary, but for what is common; not for the few, but for many. The object of the first Indian legislators was to employ the most effectual means of provid-

ng for the subsistence, the security, and happiness of all the members of the community over which they presided. With this view they set apart certain races of men for each of the various professions and arts, necessary in a well-ordered society, and appointed the exercise of them to be transmitted from father to son in succession. This system, though extremely repugnant to the ideas which we, by being placed in a very different state of society, have formed, will be found, upon attentive inspection, better adapted to attain the end in view, than a careless observer, at first sight, is apt to imagine. The human mind bends to the law of necessity, and is accustomed not only to accommodate itself to the restraints which the condition of its nature, or the institutions of its country, impose, but to acquiesce in them. From his entrance into life, an Indian knows the station allotted to him, and the functions to which he is destined by birth. The objects which relate to these, are the first that present themselves to his view. They occupy his thoughts or employ his hands; and from his earliest years, he is trained to the habit of doing with ease and pleasure, that which he must continue through life to do. To this may be ascribed that high degree of perfection conspicuous in many of the Indian manufactures, and though veneration for the practices of their ancestors may check the spirit of invention, yet, by adhering to these, they acquire such an expertness and delicacy of hand, that Europeans with all the advantages of superior sciences, and the aid of more complete instruments, have never been able to equal the exquisite execution of their workmanship. While the high improvement of their more curious manufactures excited the admiration, and attracted the commerce of other nations; the separation of professions in India, and the early distribution of people into classes, attached to particular kinds of

labour, secured such abundance of the more common and useful commodities as not only supplied their own wants, but ministered to those of the countries around them.

To this early division of the people into castes we must likewise ascribe a striking peculiarity in the state of India ;— the permanence of its institutions and the immutability in the manners of its inhabitants. What now is in India always was there and is likely still to continue, neither the ferocious violence, and illiberal fanaticism of its Mahomedan conquerors nor the powers of the European masters have effected any considerable alteration. The same distinction of condition takes place, the same arrangements in civil and domestic society remain, the maxims of religion are held in veneration and the same sciences and arts are cultivated. Hence, in all ages, the trade with India has been the same ; gold and silver have uniformly been carried thither in order to purchase the same commodities with which it now supplies all nations ; and from the ages of Pliny to the present times, it has been always considered and execrated as a gulf which swallows up the wealth of every other country that flows incessantly towards it, and from which it never returns. According to the accounts which I have given of the cargoes anciently imported from India, they appear to have consisted of nearly the same articles with those of the investments in our own times, and whatever difference we may observe, seems to have arisen, not so much from any diversity in the nature of the commodities which the Indians prepared for sale, as from the variety in the tastes, or in the wants of the nations which demanded them."

Robertson's Disquisitions on Ancient India.

হিন্দুদের মধ্যে যেরূপ জাতিভেদ আছে—তাহাদের মধ্যে

জন্মভেদে যেরূপ কর্ম্মভেদ হইয়া থাকে, এইরূপ জাতিভেদের কথা শুনিলেই, প্রথমে মনে হয় যে, এই ব্যবস্থা বিজ্ঞানের এবং কলা-বিদ্যার উন্নতির প্রতিবন্ধক। প্রত্যেক জাতির চারি-দিকে কৃত্রিম গণ্ডী দিয়া,যদি ঐরূপ গণ্ডীর বাহিরে যাওয়া অধর্ম্ম বলিয়া ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে, মনুষ্য-বুদ্ধির কার্য্যকরী শক্তির স্বাভাবিক প্রসর ক্রমেই কমিয়া আসে। মানব যদি নিজ প্রবৃত্তিমত আপনার মনোমত উদ্দেশ্য-সাধন জন্য, আপনার লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে স্বাধীনতা পায়, তাহা হইলে তাহার প্রতিভার সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হয়, চেষ্টা ফলবতী হয় এবং সে উন্নতির উচ্চতম চূড়ে প্রতিষ্ঠা পায়। সুতরাং ভারতের জাতিভেদের ব্যবস্থা অবশ্যই সময়ে সময়ে, প্রতিভার একান্ত প্রতিকূল হয় এবং যে বুদ্ধিশক্তি উচ্চতর জাতির ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিত, সেই শক্তিকে নিম্নতর জাতির কার্য্যকলাপে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে। (এই সকল আপত্তি খণ্ডনের জন্য রবটসন সাহেব বলিতেছেন)—কিন্তু দেখিতে হইবে যে, সভ্য জনপদ সকলের ব্যবস্থাবলী, অসাধার-ণকে লক্ষ্য করিয়া হয় না, সাধারণকে লক্ষ্য করিয়াই হয়, অল্প সংখ্যক ব্যক্তির জন্য নহে, অধিকাংশ লোকের কিসে ভাল হয়, কিসে তাহাদের দুর্গতি না হয়, তাহা লক্ষ্য করিয়াই হয়, যে সমাজের শীর্ষস্থানে ঋষিরা ছিলেন, সেই সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের কিসে গ্রাসাচ্ছাদন চলে, সুখস্বচ্ছন্দ হয়, তাহারই বিশেষ কার্য্যকরী পন্থা তাঁহারা স্থির করিয়া গিয়াছেন।

একটি বিস্তীর্ণ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজে যেরূপ ব্যবসায়-ভেদ ও কার্য্যভেদ থাকিলে, তাঁহাদের উপরি উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, সমাজের লোকগুলিকে বর্ণভেদে সেইরূপ বিভাগ করিয়া, পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে পুরুষপরম্পরায় সেই ভেদ রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। ইহারি নাম জাতি-ভেদ। আমাদের (য়ূরোপের) সমাজ সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির, সেই সমাজে আমরা পালিত হইয়া, যেরূপ মত পরিপোষণ করি, জাতিভেদের ব্যবস্থা, সেরূপ মতে একেবারে নিতান্ত বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু মনোযোগপূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করিলে, আমরা বুঝিতে পারি, যে উদ্দেশ্যে সমাজ-বন্ধন, সে উদ্দেশ্য জাতিভেদের ব্যবস্থাতেই বেশ সুসিদ্ধ হয়; উপরি উপরি ভাসা ভাসা দেখিলে এটা বুঝা যায় না। মনুষ্য-স্বভাব প্রয়োজন মত পরিবর্ত্তিত হয়, প্রকৃতি হইতে যে সকল সংযম অথবা সমাজের যে সকল নিয়ম, মনুষ্য-স্বভাবকে সীমাবদ্ধ করে, সেই সকল যম-নিয়মের সঙ্গে স্বভাবের সামঞ্জস্য হয়, শুধু বাহ্য সামঞ্জস্য নহে মনুষ্য-স্বভাব সেই সকল নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া থাকিতে ভালবাসে।

অতি শৈশবাবস্থা হইতেই হিন্দুসন্তান সমাজের কোন্ পদবীতে তাহার স্থান, তাহাকে আজীবন কি কি কার্য্য করিতে হইবে তাহা জানিতে পারে। কোন্ কোন্ বিষয়ে, তাহাকে শিক্ষা করিতে হইবে, তাহা সে প্রথম হইতেই বুঝিতে পারে, সেই সকল বিষয়ই সে চিন্তা করে, সেই সকল বিষয়েই

সে কার্য্য করিতে শিক্ষা করে, তাহাকে আজীবন যাহা করিতেই হইবে, তাহাই সহজে সুচারুরূপে, হাসিতে হাসিতে সম্পাদন করিতে, সে অভ্যাস করে। ভারতীয় সূক্ষ্ম-শিল্পে এবং কারখানার কারুকার্য্যে যে এত অধিক নিপুণতা আমরা দেখিতে পাই ঐ পুরুষপরম্পরাগত অভ্যাসই তাহার মূল কারণ। হয়ত এই পুরুষপুরুষানুগত প্রথায় ভক্তির জন্য, ভারতবাসীর দ্বারা কোন কিছু নূতন আবিষ্কার হয় না, কিন্তু চিরাভ্যস্ত প্রথার অনুসরণ করায় তাহারা সূক্ষ্ম-শিল্পাদিতে এমন দক্ষতা লাভ করে যে, য়ূরোপীয়গণ এত উচ্চতর বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান হইয়া এবং কত কল-কব্জার সাহায্য লইয়াও সূক্ষ্ম বিচিত্র কারুকার্য্যে এখনও তাহাদের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। ভারতবাসীর হস্তজাত শিল্পের বৈচিত্র এবং বিশেষ উন্নতি, সকল বিভিন্ন জাতির নিকট হইতেই প্রশংসা আকর্ষণ করে এবং বিদেশীয় বণিকগণ নানা দেশে সেই সকল অপূর্ব্ব দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয়ার্থ লইয়া যায়—অথচ ভারতে জাতিভেদে ব্যবসায়ভেদ থাকাতে, পরিশ্রমের তারতম্য থাকাতে, প্রয়োজনীয় সাধারণ দ্রব্য সামগ্রীর আপনাদের মধ্যে কখনই অপ্রতুল হয় না, প্রত্যুত বিদেশী জনগণের ব্যবহারে লাগিয়া থাকে।

বহুকাল হইতে ভারতে এই জাতিভেদ প্রথা থাকাতে, ভারত সমাজের আর একটি আশ্চর্য্য বিশেষত্ব হইয়াছে—সমাজের সকল প্রথাই একটি চিরস্থায়ী ভাব লাভ করিয়াছে, ভারতবাসীর প্রায় সমস্ত আচার ব্যবহার একপ্রকার অপরিবর্ত্ত-

নীয় হইয়াছে। এখন যাহা ভারতে আছে,পূর্ব্বেও তাহাই ছিল, বোধ হয় পরেও তাহাই থাকিবে। মুসলমান বিজেতাগণের সেই ভীষণ দৌরাত্ম্য, সেই অনুদার ধর্ম্মান্ধতা—য়ুরোপীয় প্রভু-গণের অতুল প্রতাপ, বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে নাই। সামাজিক অবস্থার তারতম্য, পূর্ব্বের মতই আছে, সমাজে এবং গার্হস্থে পূর্ব্বমত ব্যবস্থাই আছে, ধর্ম্মের শাসন প্রায় পূর্ব্বমতই মানে; এবং বিজ্ঞানের ও শিল্পের চর্চ্চা পূর্ব্ব-মতই করে। সুতরাং ভারতের সহিত অন্য দেশের বাণিজ্য পূর্ব্বমতই চলিতেছে। ভারতকে সোণা-রূপা দিয়া বিদেশী বণিক দ্রব্যসামগ্রী লইতেছে। (ইহার পর রবর্টসন উদাহরণ দিয়াছেন, সেই ভাগের অনুবাদ দিলাম না)।

রবর্টসন বহুকাল পূর্ব্বে ঐ সকল কথা লিখিয়াছেন; ও সকল কাজেই পুরাণ কথা। পুরাণ বলিয়া তুচ্ছ করিতে যাঁহারা অভ্যস্ত তাঁহাদের কাছে ঐ সকল কথার মূল্য বড় অল্প হই-য়াছে। সেই জন্য একটি নব্য গ্রন্থকারের গ্রন্থ হইতে আমরা একটু উদ্ধৃত এবং উদ্ধৃত অংশ অনুবাদিত করিয়া দিতেছি। তিনি অতি স্বল্পাক্ষরে, স্পষ্ট কথায় বলিতেছেন, যে জাতিভেদ থাকাতেই এত ঝঞ্ঝাবাত-বন্যায় আমাদের অস্তিত্ব আছে।

· "If the inhabitant of that Law-flooded land had not erected his social dams, din the shape of caste-customs, whereby he has been able to stem the inroads of Christian vigour as well as of Mahomedan violence, it is difficult to see how he could have prevented himself from retrograding into a semi-animal

existence. A perpetual flux in the whole structure of human relations is not the best social medium for the realisation of higher possibilities ; and yet this would have been the inevitable result, without the powers of resistance residing in caste prejudices."

Discontent and Danger in India—by A. K. CONNEL, M.A.

যদি শাস্ত্রপ্লাবিত ভারতের অধিবাসী জাতিভেদ ব্যবস্থার আকারে একটি সামাজিক দৃঢ় বাঁধ আপনার চারিদিকে না দিয়া রাখিত—সেই বাঁধের দ্বারাই সে খ্রীষ্টানের প্রতাপ-স্রোতের এবং মুসলমানের দৌরাত্ম্য-বন্যার প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছে,—সেই বাঁধ যদি না দিত, তাহা হইলে সে যে সভ্যতার পদবীতে পিছাইয়া গিয়া অর্দ্ধ মনুষ্য অর্দ্ধ জন্তুর অবস্থায় নীত হওয়ার দুর্গতি হইতে কিরূপে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিত, তাহা বুঝা বড় কঠিন। যদি কোন মানবসমাজে চিরদিনই বন্যার পর বন্যা প্রবেশ লাভ করে, তবে মানবজীবনের ঔৎকর্ষ সাধন করার পক্ষে, সে সমাজে বড় সুবিধা হয় না ; যদি জাতিগত কুসংস্কাররূপ বাঁধের ঐরূপ বিদেশী বিধর্ম্মীর বন্যা প্রতিরোধ করিবার শক্তি না থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ভারতবাসী ভাসিয়া যাইত।

তবেই হইল, জাতিভেদগত সংস্কারই ভারতবাসীকে রক্ষা করিয়াছে—আসুরীয়, মিশরীয়—যবন, রোমক—কোথায় অতলে চলিয়া গিয়াছে, ভারতবাসী আজিও দাঁড়াইয়া আছে। নব্য সম্প্রদায় প্রায়ই বলিয়া থাকেন—সমাজের বেষ্টন-প্রাচীর

ক্রমেই উচ্চতর করা হইয়াছে—জাতিভেদের নিয়ম ক্রমেই কঠোর হইতে কঠোরতর করা হইয়াছে, যদি তাহাই হইয়া থাকে তবে কি সেটা বড়ই নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য ? আমাদের বোধ হয়, এখনকার দিনে বিদেশীর বিধর্ম্ম-বন্যা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অত্যন্ত সুদৃঢ়, সুগঠিত প্রাকার-প্রাচীরের আমাদের প্রয়োজন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব।

ব্রহ্ম-ধারণা।

"উত্তমাঙ্গোদ্ভবাজ্জৈষ্ঠ্যাদ্ ব্রহ্মণশ্চৈব ধারণাৎ।
সর্ব্বস্যৈবাস্য সর্গস্য ধর্ম্মতো ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ॥" মনু ১।৯৩।

উত্তমাঙ্গ হইতে জন্মিয়াছেন বলিয়া, জ্যেষ্ঠ বলিয়া, ব্রহ্ম ধারণা করিতে পারেন বলিয়া এই সকল সৃষ্টির ধর্ম্মত ব্রাহ্মণ প্রভু।

ব্রাহ্মণ সকলের মধ্যে জ্ঞানী ও ধর্ম্মশীল, ব্রাহ্মণ সকলের আদরণীয় বা পূজনীয়,—ব্রাহ্মণ সকলের মধ্যে পবিত্রতম বা অধিকতম ভক্তিমান্—শ্লোকে এরূপ কোন কথার আভাস নাই; অন্যান্য স্থলে সে সকল কথা আছে। এ শ্লোকে কেবল এই মাত্র আছে, তিনটি কারণে ব্রাহ্মণ সকলের প্রভু। একটি কারণ তাঁহার জাতিনিষ্ঠ, একটি বয়োনিষ্ঠ, একটি তাঁহার শক্তিনিষ্ঠ।

১। ব্রাহ্মণ উত্তমাঙ্গোদ্ভব। পৌরাণিকী ভাষায় বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। মুখ হইতে উৎপত্তি হইল, তাহাতে কি হইল? মুখ অন্যান্য অঙ্গ হইতে

শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট তাহা কিরূপে জানিব? এইরূপ সন্দেহ নিরাকরণের জন্য অব্যবহিত পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ;—

"ঊর্দ্ধং নভোর্মধ্যতরঃ পুরুষঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মান্মেধ্যতমং তস্য মুখমুক্তং স্বয়ম্ভুবা॥" মনু। ১।৯২

পুরুষ সর্ব্বতোভাবে পবিত্র ; (তাহার) নাভির ঊর্দ্ধভাগ পবিত্রতর ; তাহার মুখ সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র—ব্রহ্মা বলিয়াছেন।

মুখ যে পবিত্রতম অঙ্গ, ব্রহ্মা এই কথা বলিয়াছেন, এই কথা বলাতেই এক প্রকারে বলা হইল যে, উহাতে আর তর্ক করিও না। অথচ নাভির ঊর্দ্ধভাগ পবিত্রতর বলাতেই, একরূপ যুক্তি যে আছে,তাহার আভাস দেওয়া হইল। আমাদের হিন্দু-শাস্ত্রের প্রণালী অনেক স্থলেই এইরূপ।

পৌরাণিক বিবরণ আধুনিক ধরণে বলিতে গেলে, এইটুকু বলিতে হয় যে, বিশুদ্ধতম শ্রেষ্ঠবীজে ব্রাহ্মণের জন্ম।

২। ব্রাহ্মণ বয়োজ্যেষ্ঠ। কেন? টীকাকার বলেন, ক্ষত্রিয়াদির পূর্ব্বে উৎপন্ন বলিয়া। ব্রাহ্মণই বা কবে হইলেন, ক্ষত্রিয়ই বা কবে হইলেন? পুরাণাদি শাস্ত্র বলেন,—অগ্রে ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হন, তাহার পর তদীয় বাহু হইতে ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হন ; পরে উরু হইতে বৈশ্য ও পদ হইতে শূদ্র।* অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়া থাকেন যে, সর্ব্ব-

* শূদ্র যে অনার্য্য বা দস্যু তাহা বোধ হয় না। উপনয়নদ্বারা সংস্কৃত নহে বা সংস্করণীয় নহে এরূপ আর্য্য সন্তানই শূদ্র বলিয়া বোধ হয়। পণ্ডিতে এ কথার বিচার করিবেন। এটি যে বিচার্য্য বিষয় এ স্থলে তাহা বলিবার আমাদের একটু প্রয়োজন আছে।

প্রথমে ব্রাহ্মণেরা ভারতে আগমন ও অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন। পরে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ক্রমে ক্রমে পরে পরে আসেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, শূদ্র ভারতের অনার্য্য আদিমবাসী। আবার কেহ কেহ বলেন, শূদ্রেরা সর্ব্বশেষে ভারতে আগমন ও অধিষ্ঠান করেন। ভাষা-বিজ্ঞানের বা ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের জটিল তর্কের মধ্যে প্রবেশ না করিয়াও মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে ভারতে আর্য্য আগন্তুকগণের মধ্যে ব্রাহ্মণকে বয়োজ্যেষ্ঠ বলা যাইতে পারে। আর আমাদের পুরাণাদি শাস্ত্রে সে কথাত আছেই।

৩। ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম-ধারণা করিতে পারেন। এটি বড় কঠিন কথা। প্রথমত ব্রহ্ম কি তাহা বুঝা কঠিন; তাহার পর পুঁথী দেখে বা লোকের মুখে শুনে যদিও বা কিছু বুঝা যায়, কিন্তু সেই ব্রহ্মের যে আবার এমন কি একটা ধারণা আছে যে, তাহাতে প্রভুত্ব পাওয়া যায়, তাহা বুঝা আরও কঠিন। কিন্তু এটি না বুঝিলে, কিসে যে পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণের অসাধারণ প্রভুত্ব হইয়াছিল এবং এখনই বা কেন ব্রাহ্মণ লক্ষদ্বারী কাঙ্গালি, তাহাত বুঝিতে পারিব না। মনুর ভাষা অতি পরিষ্কার—তিনটিমাত্র কারণে ব্রাহ্মণ সকলের প্রভু। (১) জাতিতে বিশুদ্ধতম (২) স্থিতিতে আদিমবাসী (৩) শক্তিতে ব্রহ্মধারণক্ষম। প্রথম দুইটি কারণ একটু একটু বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু শেষের কারণটি বুঝাও চাই।

মুনিঋষি ব্রাহ্মণেরা কিরূপে পুরাকালে ব্রহ্মধারণা করিয়া-

ছিলেন, তাহা ভাল বুঝিতে পারি না। কিন্তু তাঁহাদের যে ব্রহ্মধারণা ছিল তাহা একটু একটু বুঝিতে পারি। আর য়ুরোপ কিরূপে ব্রহ্মধারণা করিবার পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহাও একটু একটু বুঝিতে পারি। বুঝি এই,—

ব্রহ্ম = পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ভাবি চরম সিদ্ধান্ত।

সংশ্লেষণে শক্তির একীকরণ এবং বিশ্লেষণে জড়ের একরূপত্ব প্রদর্শন—এই উভয়বিধ একীকরণ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের লক্ষ্য এবং কার্য্য।

একটি আতা পাকিলে যে শক্তিবলে উহা ভূতলে পতিত হয়, আর যে শক্তিবলে মঙ্গলবুধাদি গ্রহ আকাশপথে বিচরণ করিতেছে,—সৌরজগতে ক্ষুদ্র বৃহৎ এইরূপ সকল কার্য্যে যে কোটি কোটি শক্তি আমরা নিয়ত স্ফূরিত হইতে দেখি, তাহা মাধ্যাকর্ষণী নামে একটি ব্যাপিকা শক্তির বিভিন্ন বিকাশ মাত্র—জগদ্বিখ্যাত নিউটনের ইহাই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। ক্রমে ইহাও স্থির হইয়াছে যে, কেবল সৌরজগতেই যে মাধ্যাকর্ষণী শক্তির অধিকার, তাহা নহে ;—এই ব্রহ্মাণ্ডে আমাদের সূর্য্য-কেন্দ্রী গ্রহচক্রের মত, লক্ষ লক্ষ সৌরজগৎ বা তারকা-জগৎ আছে, যতদূর বুঝিতে পারা যায়, তাহার সর্ব্বত্রই এই মাধ্যাকর্ষণী শক্তি একা কর্ত্রীরূপে ক্রিয়মানা। ইহাকেই বলি, সংশ্লেষণে শক্তির একীকরণ।

তাহার পর বিশ্লেষণে জড়ের একরূপত্ব প্রদর্শন। সেও একরূপ একীকরণ। ঐ যে চার্ব্বঙ্গীর চম্পকাঙ্গুলির অঙ্গুরীয়ক

মণি হীরকখণ্ড, আর ঐ যে অঙ্গনের আবর্জনামিশ্রিত অঙ্গার-খণ্ড এই দুই একই পদার্থ, অসম সাহসে হাসিতে হাসিতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ঐ কথা সকলকে বুঝাইয়া দেয়। উহা রসায়নের কথা। কিন্তু রসায়নের বিশ্লেষণ, রাসায়নিক মূল পদার্থ পর্য্যন্ত গিয়াই নিবৃত্ত হয়। পদার্থবিদ্যার বিশ্লেষণ আবার সেই নানাবিধ রাসায়নিক মূলপদার্থের একীকরণ করিয়াছে। পদার্থ-তত্ত্ব বুঝাইয়াছে যে, হীরা, মুক্তা, স্বর্ণ, রৌপ্য, ক্ষার, অঙ্গার সকলই পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। সমবেত পরমাণুপুঞ্জের পরস্পর মধ্যে দূরত্বের তারতম্যে এবং পরস্পর সমাবেশের প্রকৃতিভেদে পদার্থের বিভেদ লক্ষিত হয় মাত্র। বস্তুত সকল বস্তুই এক।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান গতিতে বুঝিয়াছে মাধ্যাকর্ষণী পরমা শক্তি। স্থিতিতে বুঝিয়াছে সমবায়ী পরমাণু। সুতরাং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান দ্বৈতবাদী।

কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞান দিন দিন অদ্বৈতবাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। যদিও তাপ, তেজ, তড়িৎ প্রভৃতি পদার্থ মাধ্যাকর্ষণীর নিয়মাধীন বলিয়া এখনও প্রতিপন্ন হয় নাই, কিন্তু যখন ঐগুলি কেবল শক্তির বিকাশ মাত্র বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, তখন বুঝাই যাইতেছে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অদ্বৈতবাদের দিকে অগ্রসর।

হর্বট স্পেন্সর প্রভৃতি দার্শনিকগণ স্পষ্টতই অদ্বৈতবাদের আভাস পাইয়াছেন। তবে সেই আভাস এখনও কেবল আভাসই আছে, এখনও বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় নাই।

তাহাতেই বলিতেছিলাম,—পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ভাবি চরম সিদ্ধান্ত—

এক।

ব্রহ্মং—একমেবাদ্বিতীয়ং। ব্রহ্মই আছেন, আর কিছুই নাই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এই কথার এখনও অবধারণা করিতে পারে নাই। কিন্তু পুরাকালের ব্রাহ্মণেরা 'ধারণা' করিতে পারিতেন। মনু বলেন, এই ব্রহ্মধারণা ব্রাহ্মণের প্রভুত্বের একটি কারণ, হয়ত প্রধান কারণ। ব্রহ্মধারণায় প্রভুত্ব হয় কিরূপে?

সকলেই জানেন, ধনে প্রভুত্ব হয়, বলে প্রভুত্ব হয়, জ্ঞানে প্রভুত্ব হয়, বুদ্ধিতে প্রভুত্ব হয়। আমার ধন বাড়িলে আমার প্রভুত্ব বাড়িতে থাকে, আমার জ্ঞান বাড়িলে আমার প্রভুত্ব বাড়িতে থাকে, আমার বুদ্ধি বাড়িলে আমার প্রভুত্ব বাড়িতে থাকে। একটু আধটু প্রভুত্ব সকলেরই আছে; বেশী প্রভুত্ব হইলেই প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাকে প্রভুত্ব বলা যায়। আপনার কিছু না কিছু না বাড়িলে প্রভুত্ব হয় না। অতএব, আত্মবিস্তৃতিতেই প্রভুত্ব; আর আত্মসংঙ্কোচেই দাসত্ব। আমি যদি কেবল আপনি আর কপ্নি হইয়া কালযাপন করি, তাহা হইলে আমার কিছু প্রভুত্ব থাকে না। কে আমার কথা শুনিবে? কিন্তু যদি আমি আমার পরিবারবর্গের সকলকে আপনার বলিয়া সত্যসত্যই মনে করি, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে আমার একটু প্রভুত্ব

হয়। যদি আমার দাসদাসীদের কাহার কি খাওয়া হইল, না হইল, তাহার জন্য আমি ব্যস্ত হই, পরিবার মধ্যে কাহারও পীড়া হইলে, আমি শুশ্রূষায় নিবিষ্ট হই, আমার উপার্জ্জিত অর্থ তাহাদের ভরণ-পোষণ, সন্তোষণে চিরদিনই ব্যয় করি, তাহা হইলেই পরিবার মধ্যে আমার প্রভুত্ব আপনা আপনি হইয়া পড়ে। আমার আত্মশক্তি পরিবারে বিস্তৃত হইয়াছে, কাজেই সেই আত্মবিস্মৃতিতে আমার প্রভুত্ব হইয়াছে।

সেইরূপ যদি আমি গ্রামের সকলকে আপনা ভাবিয়া কার্য্য করি, বলের দ্বারা তাহাদের সাহায্য করি, ধনের দ্বারা তাহাদের পোষণ করি, বিদ্যাদানে তাহাদিগকে উন্নত করি, তাহা হইলেই গ্রামের মধ্যে আপনা হইতেই আমার প্রভুত্ব হয়। আত্মবিস্মৃতিই প্রভুত্বের মূল; আত্মবিস্মৃতিতেই যীশুখ্রীষ্ট প্রভু এবং চৈতন্যদেব মহা প্রভু।

আত্মবিস্মৃতির কথা এখনকার দিনে আমাদের কাছে হাস্য-কর উপন্যাস মাত্র। দেশ, প্রদেশ, গ্রাম, পল্লী দূরে থাকুক, এখন আমরা আপন পরিবারমধ্যেই আত্মবিস্মৃতি করিতে পারি না। ছোট বোনটির একটু অসুখ করিয়াছে, অতুল তাহার একটু শুশ্রূষা করিবার জন্য তাহার কাছে আসিয়া বসিল; একটু পরে অতুলের পিতা আসিয়া বলিলেন, 'অতুল, তুমি তোমার পড়ার ক্ষতি করিয়া এখানে কেন? যাও তোমার পড়ার ক্ষতি করিও না।' বালক আত্মসংকোচ শিক্ষা করিল। তাহার পর বিদ্যালয়ে গেলে শিক্ষক মহাশয় স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া

দিলেন "দেখ, কেহ কাহাকেও কিছু বলিয়া দিও না, কাহারও কাছে কিছু বলিয়া লইও না।" অতুলের আত্মসংকোচের আরও পরিপোষণ হইল। ক্রমে অতুলের পাঠ বৃদ্ধি হইল, আত্ম-কুঞ্চিতিও বাড়িতে লাগিল। তাহার পর ক্রমে য়ুরোপের মজ্জা-নীতি স্বস্ব প্রধানতা (Individuality) অতুলচন্দ্র শিক্ষা করি-লেন। অতুল এখন একজন স্বপ্রধান ব্যক্তি বা individual. আত্মবিস্মৃতির কথা উঠিলে, অতুল এখন, কখনও উপহাস করেন, কখনও দুঃখ করেন।

সম্পূর্ণ ব্রহ্মধারণা হইলে আত্মবিস্মৃতির চূড়ান্ত হয়। অল্পে অল্পে করিতে পারিলেও আত্মবিস্মৃতি বাড়িতে থাকে। পূর্ব্বকালে অল্প বিস্তর পরিমাণে এই ব্রহ্মধারণা অনেক ব্রাহ্মণেরই কিছু না কিছু ছিল, কাজেই ব্রাহ্মণের আত্মবিস্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে প্রভুত্বও ছিল। অধিকাংশ বা অনেক ব্রাহ্মণই যে নির্দ্দোষ বা নিষ্পাপ ছিলেন, এমন ধারণা করিবার আবশ্যক নাই। দেখিতে পাওয়া যাইতেছে ডিল্‌কে মহাপাপে লিপ্ত ছিলেন, অথচ তাঁহার অসাধারণ প্রভুত্ব ছিল। সেইরূপ মহর্ষি দুর্ব্বাসা মহা কোপনস্বভাব ছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রভুত্বও ছিল।

ব্রাহ্মণের যে ব্রহ্মধারণা ছিল, উপনিষৎ, গীতা, পুরাণ, ইতিহাস, দর্শন, কাব্য—সর্ব্বত্র তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্যের সর্ব্বত্র যে ভাব ওতপ্রোত রহিয়াছে, তাহা জালসৃষ্টি বা ভণ্ডকল্পনা বলিতে পারা যায় না। পুরাকালে ব্রাহ্মণের যে

অসাধারণ প্রভুত্ব ছিল, তাহা সকলেই জানেন। ব্রহ্মধারণার অর্থ—সমস্তই এক, এইটি ধারণা হওয়া। আমি, তুমি, তিনি সকলেই এক, এইরূপ দৃঢ় ধারণা হইলে, অনেকটা যে আত্ম-বিস্তৃতি হয়, তাহাও চোখের উপর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং মনু যে বলিয়াছেন, ব্রহ্মধারণা ব্রাহ্মণের প্রভুত্বের অন্য-তর (এবং গুরুতর) কারণ, তাহা অতি প্রামাণিক কথা বলিয়াই বোধ হইতেছে।

পুরাকালে ব্রাহ্মণের মহা প্রভুত্ব ছিল, এখন কিছু নাই বলিলেও চলে। কেবল বঙ্গদেশ দেখিলে ব্রাহ্মণের গভীর অধঃপতনের পূরা ধারণা হয় না। বীরভূমির প্রান্ত সাঁওতাল পরগণা হইতে, মরুভূমির মধ্যস্থ পুষ্কর পর্য্যন্ত, একবার পর্য্যটন করিয়া আইস, দেখিবে ব্রাহ্মণের কি গভীরতম অধঃপতন।

তীর্থস্থানের পুরোহিতবর্গ ব্যতীত সাধারণত দিল্লী আগ্রা, রাজপুতানা প্রভৃতি প্রদেশে ব্রাহ্মণের অবস্থা অত্যন্ত হীন। যে জাতি একদিন, এককাল ভূদেব নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে, তাহাদেরই সন্তানগণ এখন যে, অশ্বপরিচর্য্যায়, গোরক্ষণে, মৃত্তিকা কর্ষণে, ঘোর মূর্খতায় ও কঠোর দরিদ্রতায় জড়ীভূত হইয়া দিনাতিপাত করিতেছে, তাহা দেখিলে, কেবল দুঃখ হয় এরূপ নহে, হৃদয়ের আশা-ভরসা অনেক পরিমাণে আঘাত প্রাপ্ত হয়। যে দূরবীক্ষণ হস্তে, সম্মুখে দূরদৃষ্টি করিয়া সনাতনী পতাকা লইয়া অগ্রসর হইবে, সে যদি অবসন্ন

হইয়া পড়িয়া থাকিবে, তাহা হইলে ত আবার নূতন সজ্জা না করিলে চলে না!

পশ্চিম প্রদেশে সামাজিক গণনায় অনেক স্থলেই ব্রাহ্মণ চতুর্থ হইয়া পড়িয়াছে। মুসলমান এখনও তীর্থস্থান ব্যতীত অন্যত্র পাতশাহের জাতি বলিয়া প্রথম বা দ্বিতীয়; লালাও তদ্রূপ; বণিয়া কোথাও লালার সমকক্ষ, কোথাও কৃপণতা-বাদে কিছু নীচে; ব্রাহ্মণ প্রায়ই চতুর্থ। আমাদের দেশে কায়স্থ বা বণিক্‌কে আশীর্ব্বাদ করিতে হইলে, ব্রাহ্মণ হস্ত উত্তোলন করেন, এদেশে ব্রাহ্মণ আত্মগৌরব, এতই হারাই-য়াছে যে, লালাকে বা বণিয়াকে শির নত করিয়া 'বাবুজি' বলিয়া থাকে। বিদেশী মিশনরিদের কুহকে পড়িয়া যাঁহাদের মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইয়াছে, তাঁহারা ব্রাহ্মণশ্রেণীর এরূপ অধঃ-পতনে হর্ষানুভব করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা ব্রাহ্মণের প্রকৃত ইতিহাস বুঝেন, তাঁহারা এই অধঃপতন দেখিয়া মর্ম্মাহত।

তাই বলি, দাদা! তোমার ব্রহ্মধারণায় এখন কাজ নাই, তুমি একবার আত্মধারণা কর। তুমি কি ছিলে, আর কি হইয়াছ, একবার স্থিরচিত্তে বুঝিয়া দেখ। একদিন ব্রাহ্মণের কল্পনা দেব দেব বিষ্ণুবক্ষে পদাঘাত করিতেও কুন্ঠিত হয় নাই, আর আজি সেই ব্রাহ্মণের কুল-কজ্বল তোমার আপামর সাধা-রণের পদপ্রসাদ প্রাপ্তির জন্য লালায়িত!

সে দিন কয়জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তৈলবট স্বরূপ সামান্য অর্থ গ্রহণ করিয়া ব্যবস্থা দিয়াছিলেন বলিয়া, আর একজন ব্রাহ্মণ

পণ্ডিত প্রকাশ্য পত্রে অর্থের স্বল্পাকাঙ্ক্ষার কতই না উপহাস করিলেন! বল, ব্রাহ্মণের ইহা অপেক্ষা আর কি অধিকতর অধঃপতন হইতে পারে। না—অর্থ অর্থ করিয়া আর অনর্থ বৃদ্ধি করিও না—আর কাহারও দিকে না চাহিতে পার, আপনার দিকে দৃষ্টিকর। অর্থই সংসারের সার পদার্থ নহে; যদি তাহা হইত, তাহা হইলে য়ূহুদীরা ভিটামাটী ছাড়া হইয়া ভব-ঘোরে ঘুরিতেছে কেন? আমাদের দেশে শেঠিয়া কেঁইয়ার এত দুর্দ্দশা কেন? নিরবচ্ছিন্ন অর্থ লালসাতেই তোমার অধঃপতন হইয়াছে। আবার ক্রমে ক্রমে সেই মায়া কাটাইয়া উঠ; আবার সেইরূপ আত্মবিস্মৃতি শিক্ষা কর, আবার সেইরূপ আধ্যাত্মিকতা জীবনের অবলম্বন কর, দেখিবে, তুমি আবার এই সকল সৃষ্টির ধর্ম্মত প্রভু হইবে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

অদৃষ্ট ও পুরুষকার।

(হিতোপদেশ হইতে)

যখন যে স্থানে মানুষের মনে বিচার বিতর্ক আরম্ভ হইয়াছে, তখনই সেই স্থলে, দৈব ও পুরুষকার লইয়া মানুষের মনে একটা মহাগণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে, বিষম খট্‌কা লাগিয়াছে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ অদৃষ্ট-বাদকে কেবল কুসংস্কার মাত্র বলিয়াছেন ; আবার দৈবই সর্ব্বে সর্ব্বা এমনও অনেকে বলিয়াছেন। সকলেই জানেন পাশ্চাত্য কবির উক্তি :—

Man proposes,
And God disposes,
মানুষে করে আশা,
কিন্তু ঘটান জগদম্বা।

এটি দৈববাদীর কথা। পোপের উক্তিও অনেকের স্মরণে আসিতে পারে ;—

"Yet gave me, in this dark estate,
To see the good—from ill ;
Binding *nature* fast in fate,
Left free the human will."

তবু এই অন্ধকারে, ভালমন্দ দেখিবারে,
মোরে নাথ ! দিয়াছ ক্ষমতা।
অদৃষ্ট-পাশে স্বভাবে, বেঁধেছ নিগূঢ় ভাবে,
নরেচ্ছারে দিয়ে স্বাধীনতা।

ইহাতে দৈববাদের সঙ্গে পুরুষকারের সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা হইয়াছে; আবার পুরুষকারের প্রাধান্যও পাশ্চাত্য সাহিত্যে বিশেষরূপে প্রথিত হইয়াছে; বালপাঠ্য কবিতায় তাহা সকলে দেখিয়া থাকিবেন ;—

"Lives of great men all remind us,
We can make our lives sublime.
And, departing, leave behind us,
Foot-prints on the sands of time."

মহৎ চরিত্র দেখি এই মনে হয়,
সকলে মহৎ হতে আমরাও পারি ;
রেখে যেতে পারি মোরা, যাবার সময়,
সময়-সাগর-তটে পদচিহ্ন সারি।

প্রধান পাশ্চাত্য দার্শনিক মিল্ অদৃষ্ট এবং পুরুষকারের মীমাংসা করিতে গিয়া, আমাদের দেশের অদৃষ্টবাদ হইতে (Asiatic fatalism) বিভিন্ন তাঁহার নিজের একরূপ অদৃষ্টবাদ (Modified fatalism) সৃষ্টি করিয়া কি যে এক কাণ্ড করিয়াছেন তাহাও অনেকে দেখিয়াছেন। অথচ প্রকৃত হিন্দুর পক্ষে এই গণ্ডগোল একেবারে নিষ্প্রয়োজন। হিন্দু

কর্ম্মফলে বিশ্বাসবান্। কর্ম্মের অনন্ত প্রবাহ। পূর্ব্ব কর্ম্মের কতক ফল ভোগ হইয়াছে, কতক এখন ভোগ করিতেছি, বর্ত্তমান কর্ম্মেরও এখন কতক ফল ভোগ হইতেছে, কতক ফল সঞ্চিত থাকিতেছে। যে টুকু ভোগ করি সে টুকু অদৃষ্ট বা দৈবায়ত্ত, ভোগ করিতে করিতে যাহা করি, তাহা পুরুষায়ত্ত। সুতরাং দৈব ও পুরুষকার উভয়ই আমাদের জীবনের নির্দ্দেশক। পাশ্চাত্য গণিতের ভাষায় Co-ordinates. সুতরাং কার্য্যকালে কেবল দৈবের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক এবং কাপুরুষতার লক্ষণ। সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রে যেমন, হিতোপদেশেও তেমনই এই কথা পরিষ্কার করিয়া বলা আছে ;—

দৈবের প্রভাব বর্ণনায় কথিত হইয়াছে ঃ—

অবশ্যম্ভাবিনো ভাবা ভবন্তি মহতামপি।
নগ্নত্বং নীলকণ্ঠস্য মহাহিশয়নং হরেঃ॥

অপিচ। যদভাবি ন তদ্ভাবি ভাবি চেন্ন তদন্যথা
ইতি চিন্তাবিষঘ্নোঽয়মগদঃ কিং ন পীয়তে॥

কপালে যা আছে তাহা অবশ্য ঘটিবে,
সকলের শ্রেষ্ঠ যিনি তাঁরো না খণ্ডিবে ;
কপালের দোষে শিব সদা বিবসন,
সর্পের শয্যায় দেখ! বিষ্ণুর শয়ন।

না হবার যাহা, তাহা কে করে ঘটন,
যা হবার হবে, তার কে করে খণ্ডন ;

সর্ব্ব চিন্তা-বিষ নাশ করে এই জ্ঞান,
এ ঔষধ কেন লোকে নাহি করে পান?

অন্যচ্চ। সহি গগনবিহারী, কল্মষধ্বংশকারী,
দশশতকরধারী, জ্যোতিষাং মধ্যচারী।
বিধুরপি বিধিযোগাদ্ গ্রস্যতে রাহুনাসৌ,
লিখিতমপি ললাটে প্রোজ্‌ঝিতুং কঃ সমর্থঃ॥

অত্যুচ্চ আকাশে বাস, যে করে তিমির নাশ,
তারামধ্যে জ্বলে যার সহস্র কিরণ,
দেখ না! দৈবের বশে সে শশী রাহুর গ্রাসে,
ললাটে বিধির লেখা কে করে খণ্ডন।

যোঽধিকাদ্ যোজন শতাৎ পশ্যতীহামিষং খগঃ।
স এব প্রাপ্তকালস্তু পাশবন্ধং ন পশ্যতি॥

শত শত যোজন হ'তেও উচ্চ দেশে
থাকি পক্ষী, নিজ ভক্ষ্য দেখে অনায়াসে;
কিন্তু দেখ বিধি যবে বিপদ ঘটায়,
কাছেতে ব্যাধের ফাঁদ দেখিতে না পায়।

অপিচ। শশিদিবাকরয়োর্গ্রহপীড়নম্,
গজভুজঙ্গময়োরপি বন্ধনম্।
মতিমতাং চ বিলোক্য দরিদ্রতাম্,
বিধিরহো বলবানিতি মে মতিঃ॥

মাতঙ্গ ভুজঙ্গগণে দেখিয়া বন্ধন,
শশধর দিবাকরে রাহুর পীড়ন;

সুবুদ্ধি পণ্ডিতগণে দেখিয়া নির্ধন,
অলঙ্ঘ্য জানিনু ভবে বিধির শাসন।

অন্যচ্চ। ব্যোমৈকান্তবিহারিণোহপি বিহগাঃ সম্প্রাপ্নুবন্ত্যাপদম্,
বধ্যন্তে নিপুণৈরগাধসলিলান্মস্যাঃ সমুদ্রাদপি।
দুর্নীতং কিমিহাস্তি কিং সুচরিতং কঃ স্থানলাভে গুণঃ,
কালোহি ব্যসনপ্রসারিতকরো গৃহ্লাতি দূরাদপি॥

মীন থাকে সিন্ধুজলে, বিহঙ্গ আকাশে চলে,
তবু দেখ জলমধ্যে বন্ধন তাহার;
দুরন্ত কালের ঠাঁই, নিস্তার কাহারো নাই,
গুণাগুণ দেশপাত্র না করে বিচার॥

অচিন্তিতানি দুঃখানি যথৈবায়ান্তি দেহিনাম্।
সুখান্যপি তথা মন্যে দৈবমত্রাতিরিচ্যতে॥

অচিন্তিত দুঃখ কত আসিছে যেমন,
তেমনি হতেছে কত সুখের ঘটন;
এ জগতে যার ভাগ্যে যবে যাহা হয়,
সকলি দৈবের হাত জানিবে নিশ্চয়।

তথাচোক্তং। অপরাধঃ স দৈবস্য নপুনর্মন্ত্রিণাময়ম্।
কার্য্যং সুঘটিত যত্নাদ্ দৈব যোগাদ্ বিনশ্যতি॥

অনেক যতনে হয় যার সুঘটন,
সে কার্য্যে যদ্যপি ঘটে বিধি বিড়ম্বন;

সে কারণে মন্ত্রিগণ অপরাধী নয়,
অদৃষ্টের দোষ তাহা জানিবে নিশ্চয়।

এইরূপ নানা কথা শাস্ত্রে আছে, কিন্তু তা বলিয়া শাস্ত্র কখন দৈবে নির্ভর করিতে বলেন না। হিতোপদেশ হইতে সার সংগ্রহ করিয়া পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্নের উপদেশ শুনুন ;—

"অসীম সমুদ্রের ন্যায় সম্মুখে সঙ্কটাকীর্ণ বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। অর্জ্জুন যেমন কৃষ্ণকে সারথি করিয়া এবং অক্ষয় তূণ ও অজেয় গাণ্ডীব ধারণ করিয়া সমরসাগর পার হইয়াছিলেন, তেমনি তোমরাও ধর্ম্মকে সহায় করিয়া এবং অটল অধ্যবসায় ও অমেয় উদ্যোগ ধারণ করিয়া, এই কর্ম্মসাগর পার হও। দৈবের দোহাই দিয়া নিজের অস্তিত্ব লোপ করিও না। দৈবও পুরুষকার ভিন্ন কদাচ ফলপ্রদ হয় না। অতএব পুরুষকারই মানুষের একমাত্র গতি ;—"

ন দৈবমপি সঞ্চিন্ত্য ত্যজেদুদ্যোগমাত্মনঃ।
অনুদ্যোগেন তৈলানি তিলেভ্যো নাপ্তুমর্হতি॥
উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ।
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোঽত্র দোষঃ॥
যথা হ্যেকেন চক্রেণ ন রথস্য গতির্ভবেৎ।

এবং পুরুষকারেন বিনা দৈবং ন সিধ্যতি ॥
যথা মৃৎপিণ্ডতঃ কর্ত্তা কুরুতে যদ্ যদিচ্ছতি।
এবমাত্মকৃতং কর্ম্ম পুরুষঃ প্রতিপদ্যতে ॥
কাকতালীয়বৎপ্রাপ্তং দৃষ্ট্বাপি নিধিমগ্রতঃ।
ন স্বয়ং দৈবমাদত্তে পুরুষার্থমপেক্ষতে ॥
উদ্যমেন হি সিদ্ধন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ।
নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ ॥

দৈবের দোহাই দিয়া থাকা কিছু নয়,
বিনাযত্নে তিল হ'তে তৈল নাহি হয়।
লভে লক্ষ্মী সতত উদ্যোগী নরবর,
কাপুরুষ দৈবে সদা করয়ে নির্ভর ;
দৈব ছাড়ি দেখাও পৌরুষ প্রাণপণে,
কি দোষ ? রতন যদি না মিলে যতনে।
শুধু চক্রে যেমন শকট নাহি চলে,
তেমনি পৌরুষ বিনা দৈব নাহি ফলে।
যেমতি মৃত্তিকাপিণ্ড লয়ে কুম্ভকার,
ইচ্ছামত গড়ে কত বিচিত্র আকার ;
তেমতি করিয়া কার্য্য আপন ইচ্ছায়,
আপন কর্ম্মের ফল আপনিই পায়।
দৈবাৎ সম্মুখে যদি হেরে কেহ নিধি
হাতে কি নিজেই তাহা তুলে দেন বিধি ?
কুড়াইয়া লইতেও চেষ্টা করা চাই,
পুরুষের চেষ্টা বিনা কোন সিদ্ধি নাই।

ইচ্ছায় না হয় কাজ উদ্যম বিহনে,
মৃগ নাহি পশে সুপ্ত সিংহের বদনে।

পুনশ্চ ;—

উৎসাহ সম্পন্নমদীর্ঘসূত্রম্,
ক্রিয়া বিধিজ্ঞং ব্যসনেম্বসক্তম্।
শূরং কৃতজ্ঞং দৃঢ় সৌহৃদং চ
লক্ষ্মীঃ স্বয়ং যাতি নিবাস হেতোঃ॥

অতুল উৎসাহী, শূর, কার্য্যে অনলস,
কোনরূপ ব্যসনের নহে পরবশ ;
কার্য্যের ব্যবস্থা জ্ঞানে অতি বিচক্ষণ,
প্রণয়ে অটল আর কৃতজ্ঞ যে জন,
আপনি কমলাদেবী বসতির তরে,
গমন করেন সেই পুরুষের ঘরে।

হিতোপদেশের এইরূপ মীমাংসাপূর্ণ উপদেশ সকল হিন্দু-শাস্ত্রের সার। [সরল, সহজ ভাষায় অনুবাদসহ সেই সমগ্র হিতোপদেশের একটি সংস্করণ প্রকাশ করিয়া কবিরত্ন স্বয়ং ধন্য হইয়াছেন এবং আমাদের সকলকেই ধন্য করিয়াছেন।]

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

অদৃষ্ট ও পুরুষকার।

(যোগবাশিষ্ঠ হইতে)

আমার হস্ত পদ, চক্ষু কর্ণ, মন প্রাণ ছাড়া আত্মা বলিয়া একটি স্বতন্ত্র পদার্থ আছে। সকল সময়েই আছে। আমি যখন জাগ্রত তখন যেমন আছে, আমি যখন সুষুপ্ত বা সম্মোহ প্রাপ্ত তখনও তেমনই আছে। আমার মরণের পরও থাকিবে, এই দেহে এইরূপে থাকিবে না বটে, কিন্তু অন্য দেহে থাকিবে। এই সকল অতি গূঢ় কথা বটে, কিন্তু এগুলি হিন্দুকে বুঝাইতে হয় না। এই দেশে এই সকল কথার বহুকাল যাবৎ নাড়া চাড়া হওয়াতে আমাদের রক্তের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। অজ্ঞ বিজ্ঞ সকলেই এই সকল কথার উপর নির্ভর করিয়া, সংসারে কার্য্য করিয়া থাকেন। পূর্ব্বজন্মবাদ, পরজন্মবাদ আমাদের অস্থিমজ্জায় প্রতিষ্ঠিত।

আমরা বিশ্বাস করি—

> "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
> ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।" গীতা ২।২০।

আমরা বিশ্বাস করি :—

> "বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
> নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।

তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥” গীতা ২।২২।

আর বিশ্বাস করি—কর্ম্মফলে। আত্মা শাশ্বত—নিত্য। সেই আত্মার কার্য্যফলও তাহার সঙ্গে সঙ্গে আছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল ইহজন্মে কতক ভোগ হইতেছে, পর পর জন্মেও হইবে, আবার ইহ জন্মের কর্ম্মফল কতক ইহজন্মে, কতক পর পর জন্মে হইবে। এই স্রোতের বিরাম নাই।

পুরুষকারের ফল—কর্ম্ম। গমন, ভোজন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই পুরুষকারের ফল। পুরুষকারের একটি ধারাবাহিক স্রোত লইয়াই জীবন—জীবন আর কিছুই নহে। কাজেই পুরুষকার দ্বিবিধ—প্রাক্তন এবং বর্ত্তমান। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যে পুরুষকার হইয়াছিল, এখনও তাহার ফল চলিতেছে বা ফলিতেছে, তাহাই প্রাক্তন; প্রাক্তনকে দৈব বা অদৃষ্ট বলে। প্রাক্তন পুরুষকার, বর্ত্তমান পুরুষকার দ্বারা জয় করা যায়। সৎশিক্ষা দ্বারা এই সাধনা হয়। এই শিক্ষা ও সাধনাকেই তপস্যা বলা যায়। ব্রাহ্মণ বালকের পক্ষে শাস্ত্রাধ্যয়নই তাহার প্রধান সাধনা, প্রধান তপস্যা।

কর্ম্মকে শাস্ত্র-নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্যই শাস্ত্রাধ্যয়নের একান্ত প্রয়োজন। বৃত্তিলাভ, যশোলাভ বা ‘সহচর’ লাভ—এই সকল শাস্ত্রাধ্যয়নের ফলও নহে, উদ্দেশ্যও নহে। কিন্তু আমাদের দুর্দ্দশাবশত, এখনকার দিনে, অনেক স্থলে, এগুলিই যেন পরম পুরুষার্থ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। যাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর,

তাহাই যেন জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য হইতেছে। শাস্ত্রা-ধ্যয়নের যে প্রধান উদ্দেশ্য কর্ম্মকে শাস্ত্রে নিয়ন্ত্রিত করা—তাহা অনেকেই ভুলিয়া যাইতেছেন, অথচ শাস্ত্র-নিয়ন্ত্রিত কর্ম্মই পরম ইষ্টসাধক। শাস্ত্র বহির্ভূত কর্ম্ম অনিষ্টের মূল। শুভকর্ম্ম দ্বারা শুভ ফল প্রাপ্তি হয়, অশুভ কর্ম্ম দ্বারা অশুভ ফল লাভ হয়। দৈব বা অদৃস্ট নামে স্বতন্ত্র বস্তু আর কিছু নাই। দেবতার কার্য্যকে দৈব বলিলে, দেবতাওত কর্ম্মফলের বশ। ভক্তির ভগবান। সুতরাং পুরুষকারের প্রধান্য সর্ব্বত্রই।

শাস্ত্রের কথা—

যতক্ষণ না ঐহিক সৎকর্ম্ম দ্বারা প্রাক্তন দুরদৃষ্ট পরাস্ত হয়, ততক্ষণ ঐহিক সৎকর্ম্মে যত্ন করিবে। প্রাক্তন দোষ ঐহিক কর্ম্ম দ্বারা নিশ্চয়ই পরাস্ত হয়। উদ্যোগহীন পুরুষ-গর্দ্দভের সমান হওয়া ভাল নয়। শাস্ত্রানুসারী উদ্যোগ ইহলোক এবং পরলোকের উপকারী। সৎশাস্ত্রের বিধি অনুসারে সৎসঙ্গে থাকিয়া সদাচারপূর্ব্বক পুরুষার্থ সাধন করিলে সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায়, নতুবা উপযুক্ত ফললাভ হয় না, ইহাই কর্ম্মের নিয়ম।

শাস্ত্র ও সদাচার দ্বারা প্রকাশিত দেশ-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা যে চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞানলাভ হয়, তাহা হৃদয়বলে পরিণত হইলে, সৎকর্ম্মের সাধনেচ্ছা হয়, ক্রমে তদর্থ শারীরিক চেষ্টা হয়, ইহাকেই পৌরুষ বলিয়া থাকে। বুদ্ধিবলে পুরুষকার অবলম্বন করিয়া সতত যত্নবান্ হওয়া উচিত, তাহার পর সৎশাস্ত্র, সাধু-গণ ও পণ্ডিতগণের সেবা দ্বারা ঐ প্রযত্নকে সফল করা কর্ত্তব্য।

শাস্ত্রালোচনা গুরূপদেশ, ও স্বীয় প্রযত্ন এই ত্রিতয় সাহায্যেই সর্ব্বত্র: পুরুষার্থ সিদ্ধি হয়, ইহাতে কদাচ দৈবের বা অদৃষ্টের অপেক্ষা করে না। অশুভ পথে প্রধাবিত চিত্তকে যত্নবলে শুভ পথে লইয়া যাইতে হইবে, ইহাই সমুদয় শাস্ত্রের অর্থ।

ইহজন্মের পূর্ব্বতন কুকার্য্য যেমন সৎকর্ম্ম দ্বারা বিমল হইয়া শুভে পরিণত হয়, সেইরূপ প্রাক্তন কর্ম্মও হইবে, অতএব যত্ন-পূর্ব্বক সৎকার্য্যে চেষ্টিত হওয়া কর্ত্তব্য।

এই জগতে দৈবেরই যদি কর্ত্তৃত্ব থাকে, তাহা হইলে পুরুষের চেষ্টায় প্রয়োজন কি? শাস্ত্রোপদেশ কেন? শাস্ত্রের বিধি নিষেধ, তবে কিসের জন্য? দৈবই যদি সকল কর্ম্ম করিবে, তবে পুরুষ নিশ্চেস্ট হইয়া থাকুক। এই জগতে দৈবই যদি জীবসমূহের নিয়োগকর্ত্তা হন, তাহাহইলে জীবসমূহ শয়ন করিয়া থাকুক দৈবই সমুদয় করিবে।

উপসংহার।

এই বিষয়ে মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের মীমাংসা সুন্দর।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,—

"দৈবে পুরুষকারেচ কর্ম্ম সিদ্ধির্ব্যবস্থিতা।
তত্র দৈব মভিব্যক্তং পৌরুষং পৌর্ব্ব দৈহিকং" ॥ ১।৩৪৯।

দৈব এবং পুরুষকার এই উভয়ের সাহায্যে ফলসিদ্ধি

হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে আবার পূর্ব্বজন্মকৃত অভিব্যক্ত পুরুষকারই দৈব।

"কেচিদ্দৈবাৎ স্বভাবাচ্চ কালাৎ পুরুষকারতঃ।
সংযোগে কেচিদিচ্ছন্তি ফলং কুশলবুদ্ধয়ঃ॥" ১।৩৫০।

কেহ দৈব, কেহ স্বভাব,কেহ কাল এবং কেহ পুরুষকারকে ফলসিদ্ধির প্রতিকারণ বলেন। আর কুশলবুদ্ধিগণ বলেন, এই সকলের মিলনে ফলসিদ্ধি হয়।

মনু বলেন,—

"সর্ব্বং কর্ম্মেদমায়ত্তং বিধানে দৈবমানুষে।
তয়োর্দ্দৈবমচিন্ত্যন্তু মানুষে বিদ্যতে ক্রিয়া॥" ৭।২০৫।

সংসারের যাবতীয় কর্ম্মই দৈব এবং মনুষ্যাধীন বটে ; কিন্তু দৈব অদৃষ্টাধীন বলিয়া চিন্তার বিষয় নহে, পৌরুষ ব্যাপার দৃষ্ট, সুতরাং ক্রিয়াসাধ্য।

সুতরাং পৌরুষ দ্বারা কার্য্যসিদ্ধির চেষ্টা করিতে হয়।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

নারীধর্ম্ম।

(মনু হইতে)

শরীরের স্বভাবিক নিয়মে, যে জাতির উপর শিশুসন্তানের লালনপালনের ভার আপনা আপনি আসিয়া পড়ে, তাহাদের স্নেহ, মমতা, দয়া, মায়া কাজে কাজেই একটু বেশী বেশী হয়। এটা ভগবানের বিধানই বল, আর ডার্ব্বিনের নিয়মই বল, দুই দিক দিয়াই, আমরা একথাটা বুঝিতে পারি। স্ত্রীজাতিকে শিশুসন্তানের লালনপালন করিতে হইবে, সুতরাং তাহারা স্নেহময়ী হইয়াছে, ভগবানের করুণাময় বিধানে বিশ্বাসী এ কথাটা যেরূপ বুঝেন, পরিচালনায় উৎপত্তি স্থিতি এবং উন্নতি হয়, ডার্ব্বিনের এই মতে যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারাও সেইরূপ বুঝেন যে, স্ত্রীজাতি অধিকতর স্নেহময়ী। এ বিশ্বাস এড়াইবার এখন আর উপায় নাই। কেবল বিশ্বাস বলিয়া নয়, আমরা সকলেই কার্য্যত দৃশ্যত অনুভব করি,—নারীজাতি পুরুষ অপেক্ষা অধিকতর ভাবময়ী। ভাবময়ী বলিয়া কোমলপ্রাণা, দুর্ব্বলগঠনা। এই জন্য প্রায় সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে দেখা যায়, সংসারে পুরুষ রক্ষকরূপে ও স্ত্রীলোক রক্ষিতরূপে অবস্থান করিতেছে।

আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে এই কথাটা পরিষ্কার করিয়া লেখা

আছে; আমাদিগের সমাজে এই রক্ষক-রক্ষিত ভাব সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এই ব্যবস্থার ভাল মন্দ ফলও আমরা অনেকটা বুঝিতে পারি। যদি বুঝি এই ব্যবস্থায় অধিকাংশ স্থলে সুফল ফলে, ক্বচিৎ কখন মন্দ হয়, তাহা হইলে, সেই অবস্থা আমূল মন্দ এমন না বুঝাই—বিচক্ষণতা। কিন্তু যেরূপ কাল পড়িয়াছে, যেরূপ শিক্ষা দেশমধ্যে প্রচলিত হইতেছে, তাহাতে যে কোন বিষয়ের মন্দটাই আগে চোখের উপর পড়ে, ভালটা বুঝিতে বড় বিলম্ব হয়। কাজেই এত বড় একটা বিশ্বব্যাপিনী, চিরন্তনী প্রথার, আমরা অনেকে মন্দটাই দেখি।

তাহার পর য়ূরোপের অনেক স্থলে, স্ত্রীলোকে বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হইতে পারে না, অথচ অনেক স্ত্রীলোক আহার-আচ্ছাদন অভাবে দারুণ কষ্ট পায়; সুতরাং সেদেশে অনেক সমাজনীতিজ্ঞ লোকে ঐরূপ বৈষম্যের ব্যবস্থার উপর খড়্গহস্ত। আমরা ছেলেবেলার দাতাকর্ণ, গুরুদক্ষিণার মত সেই সকল কথা কণ্ঠস্থ করিয়াছি। নারীজাতির পরাধীনতার কথা ভাবিয়া আমরা মর্ম্মাহত হই, Subjection of Women বলিলেই আমাদের মাথা হেট হয়। কিন্তু য়ূরোপেও এই বিষয়ে বিষম মতভেদ আছে। আজ পর্য্যন্ত বিলাতে কোন নামজাদা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রীলোক পড়িতে পান না। বিষয়ের উত্তরাধিকারত নাই, বাণিজ্য-ব্যবসায়ে ধন-সঞ্চয় করিয়া যে, মহাসভার সভ্য-নির্ব্বাচন সময়ে, অমুক ভাল, অমুক মন্দ—এমন একটা মত দিবে, স্ত্রীলোকের সে অধিকারও নাই। প্রায়

সর্ব্বত্রই দেখা যায়, ব্যবহার এবং দেশাচার স্ত্রীপুরুষের সাম্য ব্যবস্থার বিরোধী।

মহা মহা পণ্ডিতেও এই সাম্যের বিরোধী। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী দেশে রুষো এক জন মহাপণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার লেখনীতে তীব্র বল ছিল, অথচ ভাষা অত্যন্ত হৃদয়াকর্ষণী ছিল। বর্ত্তমান কালে তিনিই সাম্যবাদের ভীষণ ঘোষণ-কর্ত্তা। বঙ্কিমবাবু বঙ্গদর্শনে বলিয়াছিলেন যে, পৃথিবীতে তিনবার সাম্যবাদ বিঘোষিত হইয়াছে (১) একবার শাক্য-সিংহ কর্ত্তৃক (২) আর একবার যীশুখ্রীষ্ট কর্ত্তৃক, আর (৩) শেষ বার ফরাসীবিপ্লবের পূর্ব্বে রুষো কর্ত্তৃক। রুষো কর্ত্তৃকই ফরাসীদেশে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিলেই হয়।*

সর্ব্ব সমাজের স্তর-বিধ্বংস-প্রয়াসী রুষো কিন্তু স্ত্রীপুরুষে সাম্য স্থাপনের সম্পূর্ণ বিরোধী। অন্যবিধ সাম্যের প্রতিষ্ঠা-কারী নরনারীর সাম্যের একান্ত বিরোধী।

কিরূপ যুক্তি-তর্কে রুষো এই মত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, পাশ্চাত্য বিদ্যায় আন্দোলিতপ্রাণ যুবকগণের দেখা কর্ত্তব্য। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মূল স্মৃতিকর মনুর মতও দেখা উচিত।

আমরা মনুর মতটি অগ্রে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি, তাহার পর রুষোর মতের সংক্ষিপ্তসার ইংরাজি ও বাঙ্গালাতে দিব।

---

* রুষোকে এতটা বাড়ান যে ভাল হয় নাই তাহা বঙ্কিমবাবু পরে বুঝিতে পারেন; তাঁহার সাম্য প্রবন্ধ, একবারের পর আর ছাপিতে দেন নাই।

মনুর মতে—

স্ত্রীলোক আজন্ম-মরণ পর্য্যন্ত রক্ষিতভাবে রক্ষকের নিকট থাকিবেন। ইংরাজি করিয়া বলিতে হয়, Life-long ward.

"বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা।
ন স্বাতন্ত্র্যেণ কর্ত্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্য্যং গৃহেষ্বপি॥" মনু ৫।১৪৭।

স্ত্রীলোক বালিকাই হউন, যুবতীই হউন, বা বৃদ্ধাই হউন, গৃহে থাকিয়া স্ত্রীলোকের কিঞ্চিৎ মাত্র কার্য্যও স্বতন্ত্রভাবে করা উচিত নয়।*

তবে, কি ভাবে কার্য্য করিবে? উত্তরে পর শ্লোকে মনু বলিয়াছেন;—

"বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্॥" মনু।৫।১৪৮।

স্ত্রীলোক বাল্যাবস্থায় পিতার বশে, যৌবনে স্বামীর বশে, স্বামী মরিয়া গেলে পুত্রের বশে থাকিবে; কিন্তু কখন স্বাধীনভাবে অবস্থান করিবে না।

ভগবান্ মনু ঐ কথাটি একবার বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই। ঐ স্থলে ৫ম অধ্যায়ের শেষে যাহা বলিয়াছেন, আবার ৯ম অধ্যায়ের আরম্ভেই তাহা বলিয়াছেন;—

"অস্বতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ কার্য্যাঃ পুরুষৈঃ স্বৈর্দ্দিবানিশং।
বিষয়েষু চ সজ্জন্তঃ সংস্থাপ্যা আত্মনো বশে॥

---

* গৃহেষ্বপি কথাটি লক্ষ্য করিবেন, বাহিরেত নয়ই, গৃহে থাকিয়াও নয়।

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে ।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি ॥" মনু ৯।২-৩।

ভর্ত্তা প্রভৃতি স্বজনেরা দিবারাত্রি মধ্যে কদাপি স্ত্রীজাতিকে স্বাধীন অবস্থায় অবস্থান করিতে দিবেন না, বরং সদা অনিষিদ্ধ রূপ-রসাদি বিষয়ে প্রসক্ত করত তাহাদিগকে নিয়ত স্ববশে সংস্থাপন করিবেন। স্ত্রীজাতি কৌমারাবস্থায় পিতাকর্ত্তৃক, যৌবনে ভর্ত্তাকর্ত্তৃক এবং স্থবিরাবস্থায় পুত্রকর্ত্তৃক রক্ষণীয়া; ইহারা কদাপি স্বাধীনাবস্থায় অবস্থানের যোগ্য নহে।

এইরূপ বহুতর শ্লোক উদ্ধৃত করিতে পারা যায়, কিন্তু প্রয়োজন কি? তবে একটি পৌরাণিক গল্প বলি; মনু বলিয়াছেন—

"নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতম্।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে ॥" মনু ৫।১৫৫।

স্ত্রীলোকের স্বামীর সঙ্গে ভিন্ন পৃথক যজ্ঞ নাই, স্বামীর অনুমতি বিনা ব্রত এবং উপবাস নাই। কেবল পতিসেবা দ্বারাই স্ত্রীলোক স্বর্গে গমন করেন। এই হইল শাস্ত্র, এইবার গল্প।

চিরকালই দেবতায় এবং অসুরে মহাদ্বন্দ্ব। সমুদ্র-মন্থনের সময় একবার মিল-যুল হইয়াছিল; তাহার পর দেবতারা যখন অসুরদিগকে ফাঁকি দিয়া সমস্ত অমৃত আত্মসাৎ করিলেন, তখন সেই আক্রোশে অসুরেরা মহা হাঙ্গামা করিতে লাগিল। দেবতাদের মনে তখন একটা বড় ভরসা হইয়াছে যে, তাঁহারা

যখন অমৃত পান করিয়াছেন, তখন তাঁহাদের ত মৃত্যু নাই; অসুরেরা যতই কেন বলীয়ান্ হউক না, তাহারা দেবতাদের মারিয়া ফেলিতে ত পারিবে না, অথচ পাকে পাইলেই দেবতারা অসুরদের মারিয়া ফেলিতে পারিবেন, সুতরাং অসুরের সংখ্যা ক্রমে কমিয়া যাইবে। কিন্তু এ ভরসা বহুদিন রহিল না; অসুরেরা মধ্যে মধ্যে পরাজিত হইলেও, একটিও অসুর প্রাণে মারা পড়িল না। অথচ অসুরেরা রাজসিক বলে বলীয়ান্, দেবতাদের নাকের জলে, চোখের জলে করিয়া তুলিল। দেবতারা আপনাদিগকে মহা বিপন্ন বোধ করিতে লাগিলেন, মন্ত্রণা-সভা আহূত হইল। কি কর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য পরামর্শ হইতে লাগিল। অনেকেরই মনে এই প্রশ্ন উদিত হইল, অসুরেরা অমৃত পান করিতে পায় নাই, তবে মরে না কেন? এ কথার আর সদুত্তর হয় না। শেষে পদ্মযোনি যোগচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেবতাগণকে বুঝাইয়া বলিলেন, "অসুরদের স্ত্রীগণ একান্ত পতিরতা, মহা পতিব্রতা; যুদ্ধাবসানে তাহারা প্রাণ দিয়া পতির শুশ্রূষা করে; অসুর-রমণীগণের অসাধারণ সতীত্বের গুণে, তাহাদের আয়তির বলে এবং ঐরূপ কায়মনোপ্রাণের শুশ্রূষায়, অসুরগণ জীবিত থাকে,—কিছুতেই তাহাদের প্রাণবিয়োগ হয় না।" কথাটি প্রাণে লাগিল, দেবতারা মুখ চাওয়া-চায়ি করিতে লাগিলেন। কথাটা ঠিক—কিন্তু এখন প্রতিবিধানের উপায় কি? নারায়ণ বলিলেন, "উপায় করিব; আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-বেশে পুরোধা মূর্ত্তিতে অসুর রমণীদিগের মধ্যে ব্রতনিয়মাদির

প্রাধান্য বিবৃত করিব ; স্বর্গাদির লোভ দেখাইয়া তাহাদিগের মন বহুতর ব্রত-যজ্ঞের দিকে আকৃষ্ট করিব, ব্রত উপবাসাদি করিতে তাহাদিগকে লওয়াইব।” নারায়ণের কথাও যা, কাজও তা। কায়-ব্যূহ করিয়া বহুতর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-বেশে নারায়ণ অসুর ভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কপালে দীর্ঘ ফোঁটা, মস্তকে লম্বিত শিখা, স্কন্ধে পট্ট নামাবলি, কক্ষে জীর্ণ পুঁথী—অসুরদিগের পাড়ায় পাড়ায়, তাহাদিগের অন্তঃপুর-মধ্যে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ পুরাণ-ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। বলেন,—“কল্য চন্দন-চতুর্থী, এই দিন উপবাস করিয়া পুষ্পচন্দন দান করিলে, স্বর্গে গতি হয়।” বটে। কত চন্দন, কত পুষ্প ? বলেন “যাহার যেমন সাধ্য ; কেহ সাতটি পুষ্প দিবে, কেহ বা সহস্র পুষ্প দিবে, তবে যত অধিক পরিমাণে ভিন্ন ভিন্ন পুষ্প হয়, ততই ভাল।” তখন নানা পুষ্পসংগ্রহের জন্য অসুর-নারীদের আগ্রহ হইল। এইরূপ আজ চন্দন-চতুর্থী, কাল পুষ্প-পঞ্চমী, তাহার পর সোম ষষ্ঠী ক্রমেই চলিতে লাগিল। দ্রব্য-সামগ্রী সংগ্রহের জন্য অসুর-নারীগণ ক্রমেই বিব্রত হইয়া পড়িলেন, পতি সেবায় শৈথিল্য হইল। যুদ্ধে অসুরগণ গতাসু হইতে লাগিল। হায়! অসুরগণ ক্রমে ধ্বংস পথে যাইতেছে, অথচ নরলোকে নারীরা এখনও ব্রত উপবাসের জন্য ব্যস্ত হয়!

এই যে হিন্দু-সংসারের রমণী—চিরদিনই রক্ষিতভাবে কাল কাটান, ইনি সংসারের দেবী মহা বৈজ্ঞানিক, অথচ মহা প্রেমিক অগস্ত্য কোমত যেমন প্রতি সংসারে নারী-পূজার

ব্যবস্থা করিয়াছেন,সেইরূপ নারীপূজাই আমাদের হিন্দু-সংসারে হইবার কথা। যদি তাহা না হয়, সেটা আমাদের দোষ, শাস্ত্রের দোষ নহে। মনু বলিতেছেন ঃ—

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥" মনু ৩।৫৬।

যে কুলে নারীগণের সম্যক্ সমাদর আছে, দেবতারা তথায় প্রসন্ন আছেন। আর যে পরিবারে স্ত্রীলোকের পূজা নাই, সেই পরিবারের যাগাদি ক্রিয়া-কর্ম্ম সমুদায় বৃথা হইয়া যায়।

"শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎ কুলম্।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥" মনু ৩।৫৭।

যে পরিবারের মধ্যে স্ত্রীলোকেরা সদাই দুঃখিত থাকেন, সেই কুল আশু বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যথায় স্ত্রীলোকের কোন দুঃখ নাই সেই পরিবারের সর্ব্বদা শ্রীবৃদ্ধি হয়।

"সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্॥" মনু ৩।৬০।

যে পরিবারের মধ্যে ভর্ত্তা ও ভার্য্যা উভয়ে পরস্পর পরস্পরের উপর নিত্য সন্তুষ্ট থাকেন, নিশ্চয়ই সেই কুলে কল্যাণ নিশ্চল ভাবে অবস্থিতি করে।

এইরূপ বহুতর শাস্ত্র দ্বারা স্ত্রীলোকের গৌরব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। স্ত্রীলোককে স্বামীর সহায় ও সহধর্ম্মিণী করা হইয়াছে।

সামবেদীগণের বিবাহকালে, পত্নীর এই গৌরবের অবস্থা আরও স্পষ্টীকৃত হয়। বর কন্যাকে বলেন ঃ—

"(ওঁ) সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব,
সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাং ভব,
ননন্দরিচ সম্রাজ্ঞী ভব,
সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু ॥"

শ্বশুরে সম্রাজ্ঞী হও শ্বশ্রূজনে সম্রাজ্ঞী হও, ননন্দায় সম্রাজ্ঞী হও, দেবরসকলে সম্রাজ্ঞী হও। কুলবধূ কুলে থাকিলেই সম্রাজ্ঞী, কুলের বাহির হইলেই মহা অলক্ষণ। এখন রুষোর কথা শুনুন ঃ—

(রুষো হইতে)

ROUSSEAU'S REMARKS
ON
FEMALE EDUCATION.

"The whole education of women ought to be relative to men. Women is specially made to please men, to be useful to them, to make themselves loved and honoured by them, to rear them when young, to console them, to render their lives agreeable and sweet to them ; these are the duties of women at all times, and should be taught to them from their childhood. All their caprices must be overcome so as to make them submissive to the will of others......... Depen-

dence is woman's natural condition......woman is created to be all her life subject to man and to man's judgment...... It is a law of nature that woman shall obey man......she is created to give way to man, and to suffer even his injustice. Woman is weak. She is passionate. Her heart feeds on unlimited desire of love ; it is true that "the Supreme Being added modesty" in order to counter-balance and restrain them. She is inquisitive, too much so. She is artful and necessarily so, to compensate for what she lacks in strength. Her artfulness is a natural talent and every thing natural is good and right.

Woman is more docile than man. She has more delicacy than man. She is more skilful in reading the human heart. Her dominant passion is virtue. A virtuous woman is almost the equal of the angels. Her natural qualities must be respected, be they good or ill......

A woman should remain a woman. It would be folly to wish for the cultivation of man's qualities.

Her judgment is earlier formed but she soon allows herself to be out-distanced. She has most sufficient attention and accuracy of mind to succeed in the exact sciences. Everything that tends

to generalize ideas is outside her competence. All her reflections should centre in the study of man, or in agreeable acquirements which have taste as their object. Search after abstract truth is not suitable for her. Works of genius are beyond her. In short, feminine studies should relate exclusively practical matters.

Our education is mere pedantry : every thing is taught us quite against nature. Nature must be studied and consulted, so that she may be assisted and we have saved the detriment of thwarting her."

যাঁহারা ইংরাজি ভাল বুঝিতে পারেন না, অথচ পাশ্চাত্য বুদ্ধিতে জরজর হইয়াছেন তাঁহাদের জন্য রুষোর মতের অনুবাদ দিলাম। কথায় কথায় অনুবাদ করি নাই, অথচ আসল কথা একটুও ছাড়ি নাই।

স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ বুঝিয়া স্ত্রীলোকগণকে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। সংসারে নারীজাতির সৃষ্টি,—পুরুষের মনোরঞ্জন করিতে, পুরুষের কার্য্যের সহায়তা করিতে, পুরুষের নিকট হইতে ভালবাসা ও সম্মান পাইবার জন্য। নারীর সৃষ্টি শিশু-কালে পুরুষকে পালন করিতে, বিপদে পুরুষকে সান্ত্বনা দান করিতে, পুরুষ যাহাতে জীবনে সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য উপভোগ করিতে পারে, তাহার জন্য। চিরকালই নারীর এই সকল কর্ত্তব্য এবং শৈশব হইতেই স্ত্রীলোককে এই সকল বিষয়ে

শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহাদের খেয়ালসমস্ত এরূপভাবে দমন করিতে হইবে, যেন তাহাতে তাহারা পুরুষের ইচ্ছামত চলিতে পারে। অন্যের অধীনে থাকাই স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক অবস্থা। চিরজীবন পুরুষের বশে, পুরুষের আজ্ঞাধীন হইয়া থাকিবার জন্যই নারীজাতির সৃষ্টি। স্বভাবের নিয়মই এই যে, নারীজাতি পুরুষের বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকিবে। মনুষ্যের আজ্ঞা পালন করিতে, এমন কি মনুষ্যের অবিচার ঘাড় পাতিয়া সহ্য করিতে নারীর জন্ম। নারী অবলা, নারী ভাব-প্রবণা। ভাল-বাসিবার অনন্ত-বাসনায় নারীহৃদয়ের পুষ্টি। এই ভাব-প্রবণতা দমনের জন্য, তাহাদের সংযতা করিবার জন্য ভগবান তাহাদিগকে লজ্জাবৃত্তি দিয়াছেন। নারীজাতির কৌতূহল বড় বেশী। নারীজাতি দুর্ব্বলা, কাজে কাজেই চাতুরীপরায়ণা। এই চাতুরী নারীর স্বাভাবিক গুণ। আর, যাহা কিছু স্বাভাবিক, তাহাই ঠিক, তাহাই উত্তম।

পুরুষ অপেক্ষা নারীকে শীঘ্র বশে আনা যায়। নারী কোমলপ্রাণা। মানব-হৃদয় বুঝিতে নারীর বিলক্ষণ দক্ষতা আছে। নারীজীবনে ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবময়ী বৃত্তি। ধর্ম্মশীলা নারী সংসারে মূর্ত্তিমতী দেবী। পুরুষের কর্ত্তব্য নারীর ভাল মন্দ সমস্ত স্বাভাবিক গুণসমূহের সমাদর করা।

স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোক থাকিলেই ভাল। নারীহৃদয়ে পুরুষোচিত গুণসমূহ উৎপাদনের ইচ্ছা করা বাতুলতা মাত্র।

অতি অল্প বয়সেই নারীর বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশ পায়; কিন্তু

বেটা ছেলেরা বালিকাগণকে শীঘ্র ছাড়াইয়া যায়। স্ত্রীলোক বেশ মন লাগাইতে পারে এবং স্থিরবুদ্ধিও তাহাদের বেশ আছে, কাজেই বিশুদ্ধ বিজ্ঞানশিক্ষায় তাহারা সফলতা লাভ করে; কিন্তু পাঁচটা বিষয় একত্র করিয়া একটা কিছু সিদ্ধান্ত করিতে তাহারা কিছুতেই পারে না। নারীর সমগ্র চিন্তা যেন পুরুষের দিকে কেন্দ্রীভূত হয়, সমস্ত জ্ঞানার্জ্জন যেন পুরুষের চিত্তরঞ্জন করিতে ব্যাপৃত থাকে, নারীকে এইরূপ শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক সত্যের গবেষণা নারীর দ্বারা হইবে না। প্রতিভাপূর্ণ গ্রন্থপ্রণয়ন নারীর দ্বারা হইতে পারে না। কার্য্যকরী কলাশিক্ষাই স্ত্রীলোকের উপযোগিনী।

আমাদের শিক্ষা হইতেছে কেবল বিদ্যাবত্তা ফলান। স্বভাবের বিরুদ্ধে আমাদের শিক্ষা হয়। যাহার যেটা স্বাভাবিক তাহা বুঝা আবশ্যক, ধারণা করা আবশ্যক। শিক্ষা স্বভাবের সহায় হইবে, তাহা হইলেই স্বভাব নষ্ট করিবার বিড়ম্বনা হইতে রক্ষা পাইব।

* * * * *

রুষো যেরূপ তেজ-কলমে আপনার মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার কথা বুঝাইবার কোন প্রয়োজনই নাই। যে পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদিগকে ক্রমেই বেড়াজালে ঘেরিতেছে, সেই সভ্যতার, সেই সাম্যবাদের, সেই স্বাতন্ত্র্যবাদের রুষো-শঙ্করাচার্য্য। অথচ নারীজাতির স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনের তিনি একান্ত বিরোধী। এই দেখানই আমাদের উদ্দেশ্য। 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্য

মর্হতি' মনুর এই মহদ্বাক্য যদি নব্য যুরোপের প্রতিধ্বনি হইতেও শিক্ষা করি, এই বর্ত্তমান বর্ষের মহাসভায় নারীগণের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে যে সকল বিবাদ বিতণ্ডা হইতেছে, তাহা হইতে শিক্ষা করি, তাহা হইলেই বা ক্ষতি কি? আসল কথা—উদারতা প্রদর্শনের মোহে, সমাজ-বন্ধনের মূল সাম্য মনে করিয়া, এই বিপন্ন সমাজকে আরও বিপন্ন যাহাতে আমরা না করি, সকলে মিলিয়া সেই চেষ্টা করিলেই ভাল হয়।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

শৃঙ্খলা,—সৌন্দর্য্য,—মঙ্গল।

চিত্তে প্রফুল্লতা না থাকিলে, সে চিত্তে ধর্ম্ম তিষ্ঠিতে পারেন না। যে অপ্রফুল্ল সে ধর্ম্মের ধারণাই করিতে পারে না। যদি বা তাহার ধারণা থাকে, তবে সেই ধারণা ক্রমে ক্রমে কমিয়া কমিয়া লয় প্রাপ্ত হয়। তবে যে হৃদয়ে ধর্ম্ম জট গাড়িয়া বসে, সে হৃদয় কিছুতেই বিচলিত হয় না; সে হৃদয়ের প্রফুল্লতাও কিছুতেই নষ্ট হয় না। সেরূপ সৌভাগ্য অতি অল্প লোকেরই হয়; অধিকাংশ হৃদয়ে ধর্ম্ম প্রায় ভাসা ভাসা থাকে; কাজেই অপ্রফুল্লতায় প্রায়ই নষ্ট হইয়া যায়। ক্রমিক অপ্রফুল্লতায় ধর্ম্ম নষ্ট হয় কেন—তাহা এইবার বুঝিবার চেষ্টা করিব।

পদার্থবিৎ বলেন, জগৎ শৃঙ্খলাময়; ভাবুক বলেন, জগৎ সৌন্দর্য্যময়; ধার্ম্মিক বলেন, জগৎ মঙ্গলময়। একই জিনিষ যিনি যে ভাবে দেখেন, তিনি সেই ভাবে বলিয়া থাকেন। বালকে পর্য্যন্ত এখন শিখিয়াছে,—জলাশয় হইতে বাষ্প উদ্গম হয়, সেই বাষ্পে মেঘ হয়, মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি হইতে জলাশয়ের পূরণ হয়। যদি এরূপ একটা শৃঙ্খলা না থাকে, তাহা হইলে জগৎ কিছুতেই চলিতে পারে না।

জলাশয়ের জল শুকাইলে, কে পূরণ করিবে? এই কথাই গীতাতে আর এক ভাবে বলা হইয়াছে;—

"অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি, পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো, যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥" গীতা ৩।১৪।

কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ হয়; (নিত্য কর্ম্ম পাকাদিই মনে করুন, আর শাস্ত্রীয় কর্ম্ম যাগ যজ্ঞই মনে করুন) সেই যজ্ঞের ধূম হইতে পর্জন্য মেঘ হয়; পর্জন্য মেঘের বৃষ্টিতে খাদ্য জন্মে; সেই খাদ্য হইতে জীবসৃষ্টি বা রক্ষা হয়। মনুষ্য আবার যজ্ঞ করে। ছেলেবেলার এই লিখনে, শৃঙ্খলাই বুঝিতে হয়।

বার তিথি মাস যত, একে একে গতাগত॥
বার মাস সাত বার, আসে যায় বার বার॥

দিন, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, বৎসর, কেমন শৃঙ্খলায় আসা যাওয়া করিতেছে? এমন শৃঙ্খলা না থাকিলে জগৎ চলিত কি? বীজ রোপণের সময়, শৃঙ্খলায় নির্দ্দিষ্ট আছে বলিয়াইত, আমরা সময়ে বীজ বপন করিয়া ফলের প্রত্যাশা করি; সেই প্রত্যাশার মধ্যে আরও কত শৃঙ্খলা পোষিত করি। রৌদ্রের শৃঙ্খলা, বায়ুর শৃঙ্খলা, বৃষ্টির শৃঙ্খলা, পরিশ্রমের শৃঙ্খলা—কতই না শৃঙ্খলার প্রয়োজন হয়। তাহার পর শস্যের আকারের প্রকারের শৃঙ্খলা চাই, ছোট বড় হইলে, কঠিন কোমল হইলে শস্যসংগ্রহ করাই ভার হইত। তাহার পর শস্যের বৃদ্ধির এবং পাকিবার সময়ের শৃঙ্খলা চাই। নতুবা, একটি অপুষ্ট, একটি পুষ্ট, একটির শীষই হয় নাই, একটি বা ঝরিয়া পড়িতেছে, এরূপ

হইলে বড় বিষমই হইত। এইরূপে সর্ব্বত্রই দেখিবেন শৃঙ্খলা না থাকিলে সংসার একেবারে অচল হইয়া যায়।

সেই বটফল পাতের গল্প মনে করুন। বটচ্ছায়া শীত কালে ভবেদুষ্ণঃ, গ্রীষ্মকালেতু শীতলঃ। এমন মনোরম ছায়া যে গাছের, তাহাতে যদি তাল-নারিকেলের মত বড় অথচ পড়ন্ত ফল হইত, তবে কি বিপদই না হইত! কাঁটালেরও বেশ ছায়া, বটের ন্যায় মনোরম না হউক, ঘন পল্লবের ছায়া বটে। ফলও বড়; কিন্তু পড়ন্ত একেবারেই নয়, ফল পাকিয়া গলিয়া গলিয়া পড়িবে, তবু বোঁটা খুলিবে না। দেখুন, দুইটি বৃক্ষে ছায়াদানের কি অপূর্ব্ব শৃঙ্খলা।

নানা বৃক্ষের শৃঙ্খলা দেখিতে দেখিতে বৈচিত্রে নজর পড়ে। তাল, নারিকেল, সুপারি, শাবু, গোলপাতা প্রভৃতি বৃক্ষ দেখিলে মনে হয়, কে যেন থাম গাঁথিয়া তুলিয়াছে। তালের পাতার শৃঙ্খলা একরূপ জমাট গাঁথা। নারিকেলের অন্যরূপ; পত্র বিভাগগুলি ফাঁক্ ফাঁক্। খেজুরের ছোট ছোট, মুখে কাঁটা। সুপারির আর এক প্রকার, আমপাতা একরূপ সাজান, কাঁটালপাতা অন্যরূপ সাজান। ঝাউগাছ, দেবদারু—যেন পাতার মন্দির; এই বৈচিত্রের সঙ্গে শৃঙ্খলা বুঝিলেই সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারা যায়। ইহাতে এমন বুঝিতে হইবে না যে, ছেলেরা অগ্রে শৃঙ্খলা বুঝে তাহার পর সৌন্দর্য্য বুঝে। ছেলে-দের প্রথম সৌন্দর্য্যবোধ ভালবাসা হইতে, ভালবাসা মঙ্গল হইতে। মাতা ক্রোড়ে করিয়া লালন করেন, বুকে করিয়া

শয়ন করেন, স্তন্যদানে পালন করেন, নাচাইয়া নাচাইয়া খেলা করেন, মা মঙ্গলময়ী,—কাজেই মা সুন্দরী।

আমরাও শৃঙ্খলার পূর্ব্বে অনেক সময় সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করি। অনেক সময় শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্য এক সঙ্গে বুঝিতে পারি; কোথাও বা শৃঙ্খলার পরে সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারি। ঐ যে এই ভরা ভাদ্রে মাঠে পীত-হরিৎ, হরিৎ-পীত ধানের ক্ষেত ল ল করিতেছে, মন্দমারুত-হিল্লোলে তরঙ্গায়িত হইতেছে, ঐ শস্য-শ্যামলার সৌন্দর্য্য আগে দেখিলাম? না শৃঙ্খলা আগে দেখিলাম? তা কে বলিতে পারে? তাহার পর ঐ ধান্যক্ষেত্র দেখিয়া যখন আশার উদয় হইল,—ধান বেশ হইতে পারে, দশজন লোকে পোষণ হইতে পারে,—এমন সকল কথা যখন মনে উঠিতে লাগিল, তখন মঙ্গলের আভাস আমরা পাইলাম বটে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, ধান গাছ তাই মঙ্গল আসিতেছে; কেবল ঘাসেতেও শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্য আছে, মঙ্গল কোথায়? উত্তর গাভীর খাদ্যে।

বনের বৃক্ষলতা, মাঠের ঘাস-পালা দেখিতে যেমন সুন্দর, কাজেও সেইরূপ মঙ্গলময়। গ্রামে নগরে, যেরূপ দেখিবে, রোগ ছড়ান,—জঙ্গলে মাঠে দেখিবে সেইরূপ ঔষধ ছড়ান। ইংরাজিতে বলে, Man made the town, God made the country. আমাদের বসৎ গ্রাম-নগরে, রোগ ছড়াইতেছি আমরা; তাঁহার কৃত পল্লী-প্রান্তরে ঔষধ রাখিয়াছেন তিনি, এইরূপ এও একরূপ শৃঙ্খলা।

আমাদের দেশের লোকে, কিছুকাল পূর্ব্বে, পল্লী-প্রান্তরের শোভা দেখিতে জানিতেন, বুঝিতেন, তাহাতে বিশেষ আনন্দ-বোধ করিতেন। এখনকার দিনে বহুতর ভদ্রলোক, কোটা-বাড়ী, গাড়ী-ঘুড়ী এই সকল দেখিবার জন্য লালায়িত। নগরের গলি খুঁজিতে তাঁহাদের বিরক্তি নাই—সহরের পূতিগন্ধ তাঁহারা বুঝিতেই পারেন না। তাঁহারা মোটামুটি কলা-শিল্পের সৌন্দর্য্য একটু বুঝিলেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য একেবারেই তাঁহাদের চোখে পড়ে না। স্বভাবের মাঠপ্রান্তর, স্বভাবের বনজঙ্গল, স্বভাবের নদীনির্ঝর, স্বভাবের পাহাড়পর্ব্বত, স্বভাবের নীলা-কাশ, কালমেঘ। উত্তপ্ত প্রান্তরমধ্যে স্নিগ্ধকরী বটচ্ছায়া, কৃষ্ণ-পক্ষের নির্ম্মেঘ নিশীথে অনন্ত উজ্জ্বল নক্ষত্রখচিত, প্রভাময় ছায়াপথে দ্বিখণ্ডীকৃত, সুচিত্র বিচিত্র নভোমণ্ডল,—এ সকলে তাঁহাদের আনন্দ হয় না, কেননা ঐ সকলে কোন লাভ নাই। এইরূপে লাভালাভের বিচার করিতে অভ্যস্ত হইয়া, তাঁহারা মনুষ্যত্ব নষ্ট করিতেছেন; কিন্তু এমন দিনে একথা বুঝানও মহাদায় হইয়া উঠিয়াছে। ৩০।৪০ বর্ষ পূর্ব্বে অতি সামান্য লোকে, যে সৌন্দর্য্য বুঝিত এখন পণ্ডিতে তাহা বুঝেন না—আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

এখন ক্ষোভের কথা চাপা দিয়া, ভগবানের স্থষ্টির বিচিত্র শৃঙ্খলার কথা একটু বলি:—মহাপুরুষ অক্ষয়কুমার দত্তের প্রসাদে সহস্র সহস্র বালকে এখন সৌর জগতের কথা একটু আধটু জানে। তথাপি একটা স্থূল শৃঙ্খলার পরিচয় দিব। যদিও

আমরা স্থূলদৃষ্টিতে মনে করি যে, আমরা মাঝখানে, আমাদের চারিদিকে সূর্য্যাদি ভ্রমণ করিতেছে; কিন্তু সেটা ভুল। চলন্ত রেলগাড়ীতে বসিয়া আমরা দেখি যে, আমাদের দুই পার্শ্বের গাছপালা বাড়ীঘর সমস্ত হুহু করিয়া সরিয়া যাইতেছে —সেটা যেমন ভুল, প্রকৃত কথা আমরাই তখন সরিয়া যাই, সে সকল যেমন স্থির তেমনই থাকে। বাস্তবিক বসুমতী স্থিরা নহে, বসুমতী ঘুরিতেছে, একটা ভাঁটা সরু একটি গোল খাদে ঘুরাইয়া দিলে, যেমন ঘুরিতে ঘুরিতে যায়, অথচ সেই গোল খাদের কেন্দ্র পরিবেষ্টন করে, পৃথিবীও সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে সেইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে যাইতেছে। সূর্য্য যে আমাদের কেন্দ্রস্থল তাহা জ্যোতিষে বলা না থাকিলেও পুরাণে বলা হইয়াছে। সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী অপূর্ব্ব পুরুষ আমাদের পালনকর্ত্ত; তাঁহারই শক্তিতে আমরা প্রলয়পথে চলিয়া যাই না।

সূর্য্যের অতি নিকটে বুধ তাঁহাকে পরিবর্ত্তন করিতেছে, বুধের পর শুক্র, শুক্রের পর আমাদের এই পৃথিবী, তাহার পর মঙ্গল, তাহার পর গ্রহখণ্ড কতকগুলি, তাহার পর বৃহস্পতি, তাহার পর শনি, তাহার পর উরেনস্, তাহার পর নেপচূণ। এই যে গ্রহসকল ঘুরিতেছে কেহ নিকটে, কেহ দূরে, সূর্য্য হইতে উহাদের দূরত্বের একটি অপূর্ব্ব শৃঙ্খলা আছে সেটি অতি বিস্ময়কর! বুধ সকল গ্রহ অপেক্ষা অতি নিকটস্থ। সূর্য্য হইতে বুধের দূরত্ব ৪ বলিলে, শুক্রের হয় ৭; হয় ১০; মঙ্গলের ১৬; গ্রহখণ্ড ২৮; বৃহস্পতির

৫২ ; শনি ১০০। ৪এ ৩ যোগ করিলে হয় ৭ ; ৪ এ দ্বিগুণ ৩ অর্থাৎ ৬ যোগ করিলে হয় ১০। ৪ এ দ্বিগুণ ৬ যোগ করিলে হয় ১৬। এইরূপ নিম্নস্থ তালিকায় দেখুন।

বুধ, সূর্য্য হইতে দূরত্ব			৪
শুক্র	”	”	৭＝৪＋৩
পৃথিবী	”	”	১০＝৪＋৩×২
মঙ্গল	”	”	১৬＝৪＋৩×২×২
গ্রহখণ্ড	”	”	২৮＝৪＋৩×২×২×২
বৃহস্পতি	”	”	৫২＝৪＋৩×২×২×২×২
শনি	”	”	১০০＝৪＋৩×২×২×২×২×২
উরেনস্	”	”	১৯৬＝৪＋৩×২×২×২×২×২×২

আমরা স্থূল গণনায় এইরূপ লিখিলাম, সূক্ষ্ম গণনায় একটু আধটু প্রভেদ আছে ; তা থাকুক। কিন্তু সূর্য্য হইতে গ্রহগণের দূরত্বে কিরূপ পাটীগণিতের শ্রেঢ়ীর বা শ্রেণীর শৃঙ্খলা দেখুন। কি বিস্ময়করী শৃঙ্খলা ! যেন একজন মহাগণিতবিৎ বিস্ময় উৎপাদনের জন্য এই কীর্ত্তি করিয়াছেন !!

এ ত গেল আকাশে গ্রহ-নক্ষত্র লইয়া। উদ্ভিদ-জগতে প্রতি শাখায় প্রশাখায়, পত্র-কক্ষার সংস্থানে, এইরূপ পাটী-গণিতের বিস্ময়কর শ্রেণী দেখিবেন। একটি উপশাখার পত্র-কক্ষার নীচে দিয়া একটি ফিতা জড়াইয়া, পত্রকক্ষার স্থানে কালীর দাগ দিলে, বেশ বুঝা যায়। কখন ১, ২, ৩, ৪ এইরূপ হইবে, কখন ১, ৩, ৫, ৭ এইরূপ, আবার কখনও হইবে, ২,

৩, ৫, ৬, ৮, ৯ এইরূপ, আরও কতরূপ যে হয়, তাহা কে গণনা করিতে পারে ?

এই সকল কথা পূর্ব্বে লেখা হয় নাই,—আমিই প্রথম বলিতেছি, এমন নহে। গ্রহদূরত্বের কথা পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বহু পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন, কিন্তু এই সকল কথা শিক্ষকে বালকদের মনে বসাইয়া দিবার চেষ্টা করেন না। বিজ্ঞানের মজা ছেলেদের উপভোগ করিতে দেন না। আজ কাল রসায়নী বিদ্যার চর্চ্চা বাড়িতেছে বটে, কিন্তু রসায়নী যে রসপ্রস্রবণী, তাহা ছেলেদের বুঝাইয়া দেওয়া হয় না। ছেলেরা নিম্ন শ্রেণীতে শৃঙ্খলা দেখিবে, পরে, সেই শৃঙ্খলায় সৌন্দর্য্য বা রস উপভোগ করিবে, তাহার পরে আবার সেই শৃঙ্খলায় ও সৌন্দর্য্যে পরম মাঙ্গল্য উপলব্ধি করিবে, তবে শিক্ষকের অধ্যাপনা ও তাহাদের অধ্যয়ন সার্থক হইবে। তা ত এখন হয় না। শিক্ষা সেই দিকে লইয়া যাইতে হইবে।

বৈষম্যে—সাম্য।

সাম্য-বৈষম্যের একত্র মিলনে—সৌন্দর্য্য। বৈষম্যের ভিতরে সাম্য থাকিলেই, তাহাকে শৃঙ্খলা বলে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই শৃঙ্খলা দেখিতে পাইলেই সৌন্দর্য্য-বোধ হয়। সুনীল আকাশ-পট—অতি সুন্দর। সে ত কেবলই সাম্য, তাহার মধ্যে বৈষম্য কোথায় ? তবে সাম্যে বৈষম্যের মিলনে সৌন্দর্য্য—একথা কিরূপে হইল ? হইল এইরূপে,—তোমার মাথার উপর নীলাকাশ বটে, কিন্তু একটু নয়ন নামাইলেই—একদিকে গাছপালা,

তাহাতে সবুজের লীলা খেলা, অন্য দিকে তর তর বাহিনী সুর-ধুনী—আর একদিকে কোটা বালাখানা, পশ্চাতে পীত ধান্যের তরঙ্গায়িত লাবণ্য লহরী—এই বৈচিত্রের চালচিত্রের মত আকাশের নীলপট,—কাজেই বৈষম্যে সাম্য-সংযোগে—নীলাকাশ সুন্দর, অতি সুন্দর। আবার প্রাবৃট্ কালে, যখন কালো মেঘের পার্শ্বে অতি কালো মেঘ, তাহার পার্শ্বে অত্যতি কালো মেঘ,—সেই সমস্ত বিচিত্রতাপূর্ণ আকাশ ব্যাপিয়া চপলা চালিত হয়, সেই কালোতে আলোতে, আরও বৈচিত্র হয়—প্রাবৃটের নভোমণ্ডল—আরও সুন্দর।

গৌরী সুন্দরী; শ্যামাও সুন্দরী। কেন এরূপ হয়? সেই সাম্যে বৈষম্যের কথা;—গৌরী সুন্দরী—তাঁহার কালো কেশে, কালো ভ্রূতে, কালো কালো চক্ষুতে, তাঁর নীল শাড়ীতে। আবার শ্যামা সুন্দরী,—তাঁহার আলুলায়িত, অবেণী-সম্বন্ধ, আগুল্ফলম্বিত অধিকতর কালো কেশে, তাঁহার তীক্ষ্ণোজ্জ্বল চক্ষুতে, তাঁহার ঘন-সন্নিবিষ্ট লোমরাজি বিরাজিত নিবিড় ভ্রূলতায়, তাঁহার অপূর্ব্ব ধূপ-ছায়ায়। এই ধূপছায়া কথাটিতেই, বৈচিত্রে সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট রহিয়াছে। যেখানেই দেখিবে, সাম্যের পার্শ্বে বৈচিত্র, বা সাম্যের মধ্য হইতে বৈচিত্র দেখা দিতেছে—সেই খানেই দেখিবে শোভা, সেই খানেই সৌন্দর্য্য।

চীন-রমণী ত অনুন্নত নাসিকাতেই সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করে? করে বৈকি। সে যে আজন্ম অনুন্নত নাসিকাই দেখিয়াছে।

কোন রমণীর উন্নত নাসিকা দেখিলেই তাহার বড় বিষম বোধ হয়। অত বিষম সে ভাল বোধকরে না। দশ জনের মধ্যে নাসিকার অল্প-স্বল্প বৈষম্য থাকিবে বৈকি—তথাপি সকল নাসিকার মধ্যে একটা সাম্য বা ঐক্য থাকা চাই—তবেত সেটা দেশীয় রুচি-সঙ্গত হইল—তবেত সুন্দর হইল। 'বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী'—ঈশ্বর গুপ্তের বিদ্রূপ এবং কদর্য্য চক্ষুর উদাহরণ; কিন্তু যাহাদের দেশে অনেক বিড়ালাক্ষী তাহাদের পক্ষে তাহাই সৌন্দর্য্য। কাফ্রীর ওষ্ঠ কাজেই কাফ্রীর চোখে ভাল। দেবতার কথা স্বতন্ত্র—আমরা মানুষের শাদা রঙ্ দেখিতে পারি না; নশুর 'হাঁসা ঘোড়া' হইবে—আহ্লাদের কথা, কিন্তু নশু স্বয়ং 'হাঁসা' হইবে,—সেটা কিছু প্রার্থনা নয়, তাহা হইলে লোকে যে বলিবে, নশুরামের অঙ্গে যেন 'ধবল' হইয়াছে।

সুতরাং দেশীয় ভাবে সাধারণ চক্ষুতেই দেখ, বিজ্ঞানের অসাধারণ চক্ষু দিয়াই দেখ, আর কবির রসচক্ষু লইয়াই দেখ,—বৈচিত্রে সাম্য-সংযোগেই সৌন্দর্য্য।

এই যে বৈষম্য বা বৈচিত্র অথবা বিপরীত ভাব, ইহাই সৌন্দর্য্যের সমবায়ী কারণ। সুখ-দুঃখে বিপরীত ভাব আছে বলিয়াই, মনুষ্যজীবনের সুখ-দুঃখ-সমবায়ে সৌন্দর্য্য আছে। ধনী ও নির্ধনে, বিপরীত ভাবাপন্ন বলিয়া ধনী-নির্ধনের সমবায়-যুক্ত মানব-সমাজে সৌন্দর্য্য রহিয়াছে। তবে সেটা বালক কাল হইতে বুঝিতে হইবে এবং পরে বালক-বালিকাকে বুঝাইতে হইবে।

সামাজিক বৈষম্য।

সংসারে ধনী ও নির্ধন, চিরদিনই আছে, সকল দেশেই আছে, ইহাতে আবার শৃঙ্খলাই বা কি? সৌন্দর্য্যই বা কি? আর মঙ্গলই বা কি? ধনী ও নির্ধনে অতি সুন্দর শৃঙ্খলা আছে। 'দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয়'—ধনী যদি নিজধন আপন বিলাসে ব্যয় না করিয়া, দরিদ্র-পোষণে ব্যয় করেন, তবে দেখ দেখি সমাজ কেমন সুশৃঙ্খল হয়, কেমন সুন্দর হয়, কেমন মঙ্গলময় হইয়া উঠে। এই যে পাশ্চাত্য জগতে, অনবরত ধনীর সহিত দরিদ্র পরিশ্রমীর দ্বন্দ্ব (Struggle between Capital and Labour) চলিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ সেই সকল দেশে ধনীলোকে দরিদ্রের পোষণ কর্ত্তব্য, এ কথা জানে না বলিয়া।

শিক্ষিত-অশিক্ষিতে পার্থক্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহাতে কি সমাজের শৃঙ্খলা থাকে, না মঙ্গল হয়? ধনের ন্যায় বিদ্যাও কেবল দানে সার্থক হয়; কিন্তু ধনদানে ও বিদ্যা-দানে পার্থক্য বিস্তর। ধনদানে হরিশ্চন্দ্রের মত রাজাকেও পথের ভিক্ষুক হইতে হয়, কিন্তু বিদ্যাদানে দাতার আরও মূলধনের বৃদ্ধি হয়। বিদ্যার মূল্য নাই বলিয়া, চোরে চুরি করিতে পারে না বলিয়া, আর দানে বা কিছুতেই বিদ্যার ক্ষয় হয় না বলিয়া, ধন অপেক্ষা বিদ্যা গরীয়সী। এ হেন বিদ্যা স্বয়ং উপার্জ্জন করিয়া, যদি পাঁচ জনকে না দিলে, অথবা মূল্য লইয়া যদি তাহা বিক্রয় করিতে থাকিলে, তাহা হইলে তুমি বিদ্যার সৌন্দর্য্য ফুটিতে দিলে না, তা মঙ্গল হইবে কিরূপে? এখন

একদিকে কলেজ-স্কুল-পাঠশালায়, ছাত্রগণের বেতন-বৃদ্ধির জ্বালায় আমাদিগকে জ্বালাতন করিয়াছে—অন্য দিকে অধ্যাপকগণ সভ্য দেশের মত বেতন পান না বলিয়া ভাল করিয়া পড়ান না, এই কথায় আমাদিগকে হতাশ করিতেছে। জগদীশ্বরের জল, বায়ু, আতপ, যেমন কর না দিয়া, মাসুল না দিয়া অমনই পাওয়া যায়, সেইরূপ সমাজে শিক্ষাও ঐরূপ সহজে ও সুলভে পাওয়া চাই। যেরূপ শরীরের জন্য জল, বায়ু, আতপ, মনের জন্য, আত্মার জন্য সেইরূপ সৎশিক্ষা প্রয়োজনীয়; যে সমাজে সাধারণ লোকে তাহা সহজে, সুলভে না পায়, সে সমাজ আর সভ্য কিরূপে? সেই সমাজকে সভ্য অর্থাৎ সভাসাজন্ত বলিতে হয় বল, কিন্তু তাহা মনুষ্যত্বহীন।

বলবান্ দুর্ব্বলকে রক্ষা করিবে, পোষণ করিবে, যদি পারে ত, দুর্ব্বলের চিত্তরঞ্জন করিবে, তবে সমাজের শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্য থাকিবে ও মঙ্গল হইবে। তা না হইয়া বলবান্ যদি দুর্ব্বলের কেবল পেষণে ও শোষণে সেই বল প্রয়োগ করে, তবে তাহাতে কি কখন ভাল হইতে পারে? না পেষণকারী সমাজকে সভ্য সমাজ বলা যাইতে পারে? ভারতের সামান্য কথা-বার্ত্তায়, এই সকল মহাসত্য বুঝিতে পারা যায়। ক্ষত হইতে ত্রাণ বা রক্ষা করেন বলিয়া ক্ষত্রিয় জাতি। য়ুরোপের মধ্য-কালের সেই সকল (Knight-errant) ভ্রমণকারী অশ্বারোহী ক্ষত্রিয়গণকে বলিবে অসভ্য এবং এখনকার কলওয়ালা (Capitalist) মূল-ধনীদিগকে বলিবে সভ্য?

সাধারণ ক্ষত্রিয়ের ছিল ঐরূপ লক্ষণ; তাহার পর সেই ক্ষত্রিয়ের মধ্যে একজন মহোচ্চ বংশের লোক হইতেন 'রাজা'; তাঁহার কাজ হইতেছে প্রজারঞ্জন। দেখ কেমন সামঞ্জস্য! কেমন শৃঙ্খলা! ধনী-নির্ধনে, শিক্ষিত-অশিক্ষিতে, বলবান্-দুর্ব্বলে এইরূপ সামঞ্জস্য-সাধন, শৃঙ্খলা-বন্ধন, না থাকিলে, কখনই সমাজে শান্তি, স্বস্তি, মঙ্গল থাকিতে পারে না। যদি জীবের জীবন, কেবল বাঁচিবার জন্য সংগ্রাম হয়, (Struggle for existence) তবে সমাজও অবশ্য তাহাই হইবে; ধনীতে নির্ধনে—জ্ঞানে অজ্ঞানে,—সমর্থে অসমর্থে কেবল বিরোধ ও সংগ্রাম চলিবে, জীবনে প্রফুল্লতা অন্তর্হিত হইবে, ধর্ম্মও তিষ্ঠিতে পারিবেন না। এই শান্তিময় হিন্দু সমাজে পাশ্চাত্য সমাজের এই অশান্তিকর ভাব আদর্শরূপে কলম বাঁধিয়া, সেই শান্তির প্রত্যাশা কেহ কখনই করিতে পারে না।

ন—সংগ্রাম নহে।

মনুষ্য জীবনের ন্যায়, সমাজেও বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থা আছে; এই প্রাচীন সমাজের বাল্যাবস্থায়, যখন চারিদিকে, অসুরদস্যু, দৈত্যদানব গার্হস্থ্য ধর্ম্মের বিঘ্নকারী ছিল, তখন জীবন, সংগ্রাম ছিল বৈকি; তাহার পর রাক্ষসের প্রভাব যখন প্রবল, তখনও নিয়ত সংগ্রাম ছিল। সমাজের যৌবনাবস্থায়, বহিঃশত্রু প্রায় নির্ম্মূল, তখনও আপনা আপনি মধ্যে ভীষণ জীবন-সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহাই কুরুক্ষেত্র। এখন আমরা বিরাট ভারতে মহাশান্তি পাইয়াছি, অহিংসা পরম

ধর্ম্মের মহিমা বুঝিয়াছি; ভারতের বার আনা হিন্দু আমিষ গ্রহণ করে না। অন্য দেশের তুলনায়, আমাদের দেশের লোক দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে না, লড়াই-হুজ্জৎ ত একেবারেই নাই; মামলা-মোকদ্দমাও অন্য দেশের অপেক্ষা অত্যন্ত কম; সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যমলা ভূমিতে পরিশ্রম করিতে পারিলেই উদরের সংস্থান হয়; অন্য দেশের লোকে মাসে যে পরিমাণে ব্যয় করে, আমরা সম্বৎসরে তাহাই ব্যয় করিয়া সুখে থাকিতে পারি—দিনান্তে শাকান্নের ব্যবস্থা আমাদের সুখের লক্ষণ। শম, দম, সংযম, সহিষ্ণুতা আমরা মানবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া মনে করি; 'যে সয়, সেই মহাশয়'—ইহাই আমাদের আবাল শিক্ষা। আমরা অতি প্রাচীন জাতি, কাজেই মহা বিজ্ঞ জাতি। সার্ব্বজাতিক বিবাহ, অনুলোম বিবাহ, অসুর বিবাহ, গান্ধর্ব্ব-স্বয়ংবর বিবাহ এ সকল অবস্থা পার হইয়া, এখন সবর্ণার প্রাজাপত্য বিবাহের অবস্থায় পৌঁছিয়াছি। অশ্বমেধের, দিগ্বিজয়ের অবস্থা কাটাইয়া, অঋণী-অপ্রবাসীর গার্হস্থ্য অবস্থায় আসিয়াছি—আমাদের জীবন, সংগ্রামের অবস্থা হইবে কেন?

জীবন—স্বস্তি।

যে সকল সমাজ এখনও যৌবনের রাজসিকতার, দম্ভের, দর্পের অবস্থায় রহিয়াছে, তাহাদের জীবন, সংগ্রাম বটে; কিন্তু সে ত আমাদের আদর্শ অবস্থা নহে, সে অবস্থা আমরা একরূপ ছাড়াইয়া আসিয়াছি। আমাদের অবস্থা স্বস্তির অবস্থা। আমরা পরিষ্কার ভাষায় শিখিয়াছি, "সুখ চেয়ে স্বস্তি ভাল।"

আমাদের শিক্ষার মূলে সন্তোষ; সুতরাং বৈদেশিকী, রাজসিকী, শিক্ষায় আমরা ইহ জীবন সংগ্রামের ব্যাপার করিয়া তুলিব কেন? জগতের উৎকৃষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ আমাদের শৃঙ্খলায়িত সমাজের পরিচয় দেয়, জগতের উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ আমাদিগকে সৌন্দর্য্য বুঝাইয়া দেয়, সমগ্র পুরাণ-শাস্ত্র মঙ্গলময়ের মঙ্গল বার্ত্তায় পূর্ণ। সেই সকল শিক্ষা-দীক্ষায় অনাস্থা করিয়া সংসারকে অশান্তির খনি, অমঙ্গলের আকর মনে করিব কেন?

তাল থাকিলেই ফাক্ থাকে। আনন্দে অবসাদ আসে, আনে বা থাকে। এমন একটা সময় আসিয়াছিল, যখন এই ভারতবাসী ত্রিতাপের ভয়ে চঞ্চল হইয়া উঠে। সেই ত্রিতাপধ্বংসের জন্য নানা দর্শনের উৎপত্তি হয়। কেহ বলেন, তাপ কোথায় ওটা একটা ভুল; কেহ বলেন, তাপ ও শৈত্য ও দুটাই ভুল। এক জনেরা বলিলেন, ভুল কেন? বৈষম্যেই সৌন্দর্য্য; ছায়া আছে বলিয়া আমরা আলোকের মহিমা বুঝিতে পারি,—তাপ আছে বলিয়াই আনন্দের গৌরব অনুভব করি; তবে তাপের পরিমাণ অত্যন্ত কম; আনন্দের গৌরব বুঝাইবার জন্য যতটুকু প্রয়োজন কেবল ততটুকু আছে মাত্র। পৃথিবীতে অতিতাপ মরুদেশ আছে, আর দিন দিন সেই সকলের সংখ্যাপরিমাণ কম হইতেছে।

সুখ-দুঃখ।

মানুষ শিক্ষা-বৈগুণ্যে গণনা করিতেও ভুলিয়া যায়। এক

দিন ভাত না পাইলে, সেই দুঃখটাকে ৩৬৪ দিনের ভাত-খাওয়ার সুখ হইতে অধিক বলিয়া মনে করে, কাজেই গণনায় ভুল হয়। এই ম্যালেরিয়া-ভারাক্রান্ত প্রদেশের নিভৃত নিকেতনে ভগ্ন-স্বাস্থ্য-দেহে পড়িয়া পড়িয়া শাদার উপর কালোর দাগ চড়াইতেছি—ইহাতেও সুখ বেশী, না দুঃখ বেশী? গণিতে জানিলে, না ভুলিলে, দুঃখ অপেক্ষা সুখের পরিমাণ অনন্ত গুণে বেশী। এই চারিদিকের নিবিড় জঙ্গল,—হইতে পারে, ম্যালেরিয়ার সূতিকাগার—কিন্তু ইহার অনন্ত সৌন্দর্য্য চক্ষুতে ত ধরে না। এ হরিৎ শোভা স্বর্গেও দুর্ল্লভ। আর ঐ 'কৃষ্ণ-গোকুলে' পাখীর গাল-ভরা আওয়াজের প্রাণ-ভরা সম্মোহন—তাহারই কি তুলনা হয় নাকি? আর কৃষ্ণারজনীর প্রদোষ-অন্ধকারে যখন আমাদের অতি নিকটস্থ* মঙ্গল গ্রহের উজ্জ্বল পিঙ্গল বর্ণচ্ছটা নিকট প্রতিবেশী নীলাঞ্জন-নিভ শনি-গ্রহকে উপহাস করিয়া প্রকাশ পায়, আর চতুর্দ্দিকে হীরক-চক্ষু টিপি টিপি মেলিয়া নক্ষত্রসমূহ সেই পরিহাস, উপহাস—নিয়ত লক্ষ্য করে, শ্যামাঙ্গীর অঙ্গে সেই সকল জ্যোতিষ্কপুঞ্জের খেলা—এই সকল পর্য্যবেক্ষণের অসীম আনন্দ কি পরিমাণের সামগ্রী?

শিক্ষা-বিভ্রাটে স্বভাবের সুখের ভাণ্ডার আমরা দেখিতে পাই না, দেখিতে পাইলেও উহার মহত্ত্ব বুঝিতে পারি না। বুঝিতে পারিলেও একটু সামান্য দুঃখের সহিত অনন্ত সুখ-ভাণ্ডারের গণনা করিতে জানি না; গায়ে একটা ব্রণ টন্ টন্

* ভাদ্র, ১৩১৬—লেখার সময়।

করিলে মনে করি, সংসার শুদ্ধ দুঃখময়! বাস্তবিক গণনা করিলে, অতি সহজেই বুঝা যায়, সংসার দুঃখময়—সংসারে দুঃখ আছে বটে,কিন্তু সকল রূপ সুখের সহিত গণনা করিলে দুঃখের মাত্রা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

বালককে গণিত,বিজ্ঞান—ভূগোল,ইতিহাস—সকলই শিখা-ইবে,কিন্তু নিজ নিজ সুখ-দুঃখের পরিমাণ করিতে শিখাইবে না—সে অতি বিকৃত শিক্ষা। বালক কেবল শুনিতে থাকে, দ্রব্যাদি দুর্ম্মূল্য হওয়াতে আমাদের সংসার অচল হইতেছে, রোগের জ্বালাতে আমাদের অস্থির করিয়াছে, অকাল মৃত্যুতে শোকের হাহারব গগন বিদীর্ণ করিতেছে;—মানুষ সর্ব্বদাই জ্বালাতন হইতেছে, প্রতিবেশীর করুণা নাই, রাজপুরুষদের বিচার নাই—এই সকল শুনিতে শুনিতে বালক মনে করে, সংসার নরকেরই অর্দ্ধ অঙ্গ; এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইলে, ধর্ম্মের ভাব সেই হৃদয়ে আর স্থান পায় কি? পায় না—সংসার যদি নরক,তবে আমরাও সেই নরকের অধিবাসী—নিয়ত কেবল অন্যকে জ্বালাতন করি এবং অন্য কর্ত্তৃক জ্বালাতন হই। সকলেই অপ্রফুল্ল, সকলেই বিষণ্ণ, সকলেই মলিন, সকলেই চিন্তাকুল।

সমাজ আপনার গৌরব না বুঝিয়া, আমরা যে মহৎ আর্য্য-বংশের পরিণাম—একথা ভুলিয়া গিয়া, মোহে পড়িয়া, কুহকে মজিয়া আপনাকে অতি ক্ষুদ্র, অতি লঘু, অতি দীন, অতি হীন মনে করিতেছে; তাহাতেই আমরা সর্ব্বনাশের পথে যাইতে উদ্যত হইয়াছি।

শিক্ষার চিতেন-মোহাড়া উল্টাইতে হইবে। দেখাইতে হইবে, আমাদের দয়া আছে, মায়া আছে, মমতা আছে, স্নেহ আছে, ভালবাসা আছে, ভক্তি আছে—এ সকল নরকে থাকিতে পারে না; দেখাইতে হইবে জগতের সকল জাতি অপেক্ষা আমরা জীবে দয়া অধিক করিয়া থাকি, অধিকাংশ লোক আমিষ-ত্যাগী, সকল জাতি অপেক্ষা কলহ-বিদ্রোহ, রক্তারক্তি কম করিয়া থাকি,—আমরা সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

সেবা—পরম ধর্ম্ম।

এ সমাজে দুঃখ কষ্ট নাই?—আছে বৈকি, আর সেই দুঃখ সহ্য করিবার শক্তি সকল জাতি অপেক্ষা আমাদের অধিক আছে। রোগ আমাদের অঙ্গের আভরণ। বিসূচিকা, বসন্ত, প্লেগ, বেরিবেরি—আমাদের নিত্য সহচর, আমরা সকলই সহ্য করিতে শিখিয়াছি। আর জানি—লোকের কষ্ট লাঘব করিতে; রোগে, শোকে সেবা করিতে।

সেবা পরম ধর্ম্ম; মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ। অথচ সর্ব্ব-স্থানে, সর্ব্বকালে, সকল শ্রেণীর মানবের পক্ষে সেবা সুসাধ্য সহজ ধর্ম্ম। সকলের পক্ষে, ধন বা জ্ঞান দান করিয়া লোকের উপকার করা অসম্ভব। কিন্তু সকলেই আর্ত্তের সেবা করিতে পারে, সকলেই রোগীর শুশ্রূষা করিতে পারে। সেবায় সকলেরই সমান অধিকার; সেবায় শিক্ষার ব্যাঘাত হয় না, গৃহস্থালির ক্রুটি হয় না, ভিক্ষুকের ভিক্ষায় বাধা পড়ে না। সকল আশ্রমীর সেবা পরম ধর্ম্ম; ব্রহ্মচর্য্যে যেমন, গৃহস্থেও তেমনই, আবার

বানপ্রস্থে বরং অধিকতর রূপে। সেবানন্দ ভোগে মনের বল বাড়ে, মনুষ্যত্বের গৌরব অধিকতর বুঝিতে পারা যায়। সেবা-পরায়ণ বক্তি অন্যের দুঃখ লাঘব করে, আপনি পরমানন্দ উপভোগ করে।

আর্ত্তের সেবা করিলে, তাহার মুখমণ্ডলে, একটু সচ্ছন্দতার সহিত কৃতজ্ঞতার যে অপূর্ব্ব জ্যোতি খেলিতে থাকে, তাহা সৌন্দর্য্যের একশেষ। সেবায়মান কৃতজ্ঞের মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য্য—ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। যিনি কখন প্রাণমনে আর্ত্তের সেবা করিয়াছেন, তিনিই তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন। লক্ষ্য করিলে আমরা বুঝিতে পারি, জগতে কষ্ট-দুঃখ থাকাতে আমাদের কত লাভ হইয়াছে। দুঃখ না থাকিলে সেবার প্রয়োজন হইত না, আমরা পরম ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত হইতাম। সেবা করিতে জানিলে আমরা বুঝিতে পারি, মঙ্গলালয়ের মঙ্গল বিধানে সুখে দুঃখে কি অপূর্ব্ব সুন্দর শৃঙ্খলা রহিয়াছে এবং সেই শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্য হইতে মানবের পরম ধর্ম্ম কিরূপ সম্বর্দ্ধনা প্রাপ্ত হয়।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

হিন্দু বিবাহের ব্যবস্থা।

(মনুর বিধান সুপালনীয়।)

ব্রাহ্মণ বালকের বিদ্যারম্ভের সাধারণত প্রশস্ত সময় ছয় বৎসর তিন মাস হইতে সাত বৎসর তিন মাস বয়স পর্য্যন্ত। বিশেষ স্থলে, তিন বৎসর তিন মাসের পর হইতে চারি বৎসর তিন মাস পর্য্যন্ত—বিদ্যারম্ভের সময়। অর্থাৎ কোন স্থলেই তিন বৎসর তিন মাসের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ বালকের বিদ্যারম্ভ হইবে না। আর ষোড়শ বৎসরের মধ্যে ব্রাহ্মণ বালকের বিদ্যারম্ভ হওয়া একান্ত আবশ্যক। তদন্যথায় ধর্ম্ম-নষ্ট, কর্ম্ম-নষ্ট হইবে। ৯ বৎসর ৩ মাস হইতে ১০ বৎসর ৩ মাস ক্ষত্রিয়ের প্রশস্ত কাল। বিশেষ স্থলে ৪ বৎসর ৩ মাস হইতে ৫ বৎসর ৩ মাস। অপারগ স্থলে ২২ বৎসরের মধ্যে। বৈশ্যের সাধারণত ১০ বৎসর ৩ মাস হইতে ১১ বৎসর ৩ মাস। বিশেষ স্থলে ৬ বৎসর ৩ মাস হইতে ৭ বৎসর ৩ মাস; আপৎ স্থলে ২৪ বৎসরের মধ্যে। বিদ্যারম্ভ কালের নিয়ম এইরূপ।

এখন দেখিতে হইবে শিক্ষার কাল, নিয়ম কিরূপ। আজীবন ব্রহ্মচর্য্য করিয়া অর্থাৎ দার-পরিগ্রহ না করিয়া, সুতরাং গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন না করিয়া বিদ্যানুশীলন করিব, এরূপ যাঁহাদের সংকল্প, তাঁহাদের পক্ষে তাহাই নিয়ম।

দেখা যাইতেছে যে, কলির ৬০০।৭০০ বৎসর পর্য্যন্ত, বেদ-ব্যাসের সময় পর্য্যন্ত, লোকে আকুমার-ব্রহ্মচারী হইতে পারিতেন। বেদব্যাসের পুত্র শুকদেব সেইরূপ ব্রহ্মচারী। মনুর সময় হইতে অর্থাৎ অতি পূর্ব্বতন কাল হইতে এইরূপই ছিল। কলিগত ১০০০ বর্ষ পর্য্যন্ত এইরূপই ছিল। দুই একখানি উপ-পুরাণে এরূপ ব্রহ্মচর্য্য নিষিদ্ধ হইয়াছে। দেবর দ্বারা পুত্রোৎ-পাদন, সমুদ্রযাত্রা, মধুপর্কে পশুবধ, আকুমার-ব্রহ্মচর্য্য বা কম-ণ্ডলু ধারণ ইত্যাদি উপপুরাণে নিষিদ্ধ হইয়াছে। প্রথাও সম্ভবত উঠিয়া গিয়াছিল। প্রায় আড়াই হাজার বৎসর হইল, বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হয়; সেই সময় অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু বা শ্রমণ আকুমার-ব্রহ্মচারী হইয়াছিলেন। হিন্দুদিগের মধ্যেও সেইরূপ হইতে লাগিল। শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং আকুমার-ব্রহ্মচারী; তদীয় শিষ্যগণের প্রতিষ্ঠিত দশনামী সন্ন্যাসী মধ্যে আকুমার-ব্রহ্মচারী বিস্তর আছেন। বৈদ্যনাথ দেওঘরের নিকট কর্ণিবাদের বালা-নন্দ স্বামী এইরূপ; ভূদেব বাবু কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত পাত-ঞ্জলের টীকাকার বালকানন্দ স্বামী এইরূপ; ইটাওয়া সহরের যমুনাপুলিনে আশ্রমকারী খট্-খট্ বাবাজীর শিষ্য স্বামীজী এই-রূপ আকুমার-ব্রহ্মচারী। এগুলি নিয়মের ব্যভিচার বলিতে হইবে। সাধারণত সকলেই গৃহধর্ম্মে প্রবেশ-প্রয়াসী। তাঁহা-দের পক্ষে নিয়ম এই যে, তাঁহারা উর্দ্ধত ৩৬ বৎসর, অন্তত ৯ বৎসর, বিদ্যাশিক্ষা করিবেন।

যাঁহারা অধিক কাল যাবৎ বিদ্যাশিক্ষা করিবেন, তাঁহাদের

জন্য বিদ্যারম্ভের বিশেষ কাল নিয়ম পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এইরূপ স্থলে ব্রাহ্মণের ৪০ বৎসরে পঠদ্দশার পরিসামাপ্তি হয়। আপৎপাতে যাঁহাদের বিদ্যারম্ভের বিলম্ব হইয়াছে, তাঁহাদিগকে কাজে কাজেই অপেক্ষাকৃত অল্পকাল মধ্যে পাঠ সমাপ্তি করিতে হইবে। আপৎপাতে ব্রাহ্মণ ষোড়শ বৎসরেও বিদ্যারম্ভ করিতে পারেন, তাহার পর অন্তত নয় বৎসর কাল তাঁহাকে বিদ্যাশিক্ষা করিতেই হইবে; সুতরাং এরূপ স্থলেও তিনি ২৫ বৎসরের পূর্ব্বে শিক্ষার অবস্থা ত্যাগ করিতে পারেন না। ৩৬ বৎসর ও ৯ বৎসরের গড়পড়তা ২২।২৩ বৎসর। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, সাধারণত ব্রাহ্মণ এই সুদীর্ঘকাল গুরুগৃহে বিদ্যাশিক্ষা করিতেন, তাহা হইলে, তাহার সহিত ব্রাহ্মণের বিদ্যারম্ভের প্রশস্ত কাল ৬।৭ বর্ষ ধরিলে, সাধারণত ব্রাহ্মণ ২৮।৩০ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতেন, ইহাই বুঝা যায়। ক্বচিৎ কেহ ৩৯।৪০ বৎসর পর্য্যন্তও থাকিতেন, আবার ক্বচিৎ কেহ ২৪।২৫ বৎসরেই পাঠ শেষ করিতেন।

এখনকার দিনে জ্ঞানকরী শিক্ষার কোন নিয়মই এদেশে নাই। ইংরাজী ত অর্থকরী শিক্ষা বটেই। চতুষ্পাঠীর শিক্ষাও অর্থকরী হইয়াছে। এই বঙ্গদেশে সর্ব্বোচ্চ অর্থকরী শিক্ষা অর্থাৎ ভাষা ও আইন শিক্ষা, আপাতত মনে হয়, ২১।২২ বৎসরেই সমাপ্তি হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ২১।২২ বৎসরে এম, এ, বি, এল হইলেও, তাহার পর হাইকোর্টের কোন উকীলের চিহ্নিত কেরাণী হইয়া (Articled clerk) অথবা

মফস্বল বারে নাম মাত্র লেখাইয়া অন্তত তিন বৎসর কাল, যে বখামি ও বকামি-শিক্ষা ব্যবহার মতে একান্ত কর্ত্তব্য, তাহাও শিক্ষার কাল বলিতে হইবে। কেননা ঐরূপ বিচিত্রা শিক্ষা তিন বৎসর না পাইলে, হাইকোর্টের বারে বসিবার বা মুন্সেফির জন্য রেজিষ্টার মহোদয়কে পক্ষান্তে সেলাম করিবার অধিকারই পাওয়া যায় না এবং আইনের ব্যবসায়ে কোন রোজগারই হয় না। রোজগারই এখনকার দিনে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের প্রাণ। রোজগারের জন্য, রোজগারের পূর্ব্বে যে কিছু শিক্ষা, তাহাই তখনকার কালের বিদ্যাশিক্ষা। এই শিক্ষা এখনকার দিনে, সুতরাং ২৪।২৫ বৎসরে শেষ হয়। অর্থাৎ প্রাচীন কালের অপেক্ষা ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে শেষ হয়। আমাদের আয়ুর তারতম্য দেখিলে, এই বিভেদ অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই বোধ হইবে।

পাঠ সমাপন হইলে, গুরুর অনুমতি লইয়া, ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত শেষ করিয়া দ্বিজাতিরা সবর্ণা সুলক্ষণান্বিতা ভার্য্যা বিবাহ করিবেন।

কত বয়সের? কত বয়সের পাত্র কত বয়সের পাত্রীকে বিবাহ করিবেন, তাহার কোন বাঁধা বাঁধি নিয়ম নাই—দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি কথা বলা আছে। ত্রিশ বৎসরের পাত্র বার বৎসরের হৃদ্যা কন্যাকে বিবাহ করিবেন; ২৪ বৎসরের পুরুষ অষ্টবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবেন; এবং গার্হস্থ্য ধর্ম্মে ব্যাঘাত হইতেছে এমন হইলে, শীঘ্র বিবাহ করিতে পারেন।

"ত্রিংশদ্বর্ষোদ্বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ॥" মনু ৯।৯৪।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সাধারণত ব্রাহ্মণ ২৮।২৯ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যে থাকিয়া পাঠ সমাপন করিতেন, আবার ক্বচিৎ কেহ ২৪।২৫ বৎসরেই পাঠ সমাপন করিতেন। সুতরাং ৩০ বর্ষের পুরুষে ১২ বৎসরের কন্যা ও ২৪ বৎসরের পাত্রে ৮ বৎসরের পাত্রী—এই দৃষ্টান্ত দুইটি অকারণ আনীত উদাহরণ নহে। যে বয়সে সকলে সচরাচর বিবাহ করিত, সেই বয়সের দৃষ্টান্তই দেওয়া হইয়াছে। সে সময়ে বালিকার বিবাহ কাল ৮।৯ হইতে ১২।১৩ বৎসর পর্য্যন্ত ছিল, বলিতে হইবে।

"উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ।
অপ্রাপ্তামপি তাং তস্মৈ কন্যাং দদ্যাদ্‌যথাবিধি॥" মনু ৯।৮৮।

উৎকৃষ্ট, সুরূপ এবং কন্যার যোগ্য বর প্রাপ্ত হইলে, কন্যা যদি অপ্রাপ্তবয়স্কাও হয়, তথাপি তাহাকে সেই বরে যথাবিধি দান করিবে। অর্থাৎ কন্যা অপ্রাপ্তবয়স্কা বলিয়া ইতস্তত করিবে না। কিন্তু কত বয়স পর্য্যন্ত অপ্রাপ্তবয়স্কা বলা যাইবে? অব্যবহিত পরের বচনে তাহা বুঝা যায়। ঋতুমতী হইয়াও কন্যা যাবজ্জীবন গৃহে বাস করিবে, সেও বরং ভাল, তথাপি গুণহীন পাত্রে কখন কন্যাকে প্রদান করিবে না। 'সেও বরং ভাল' এই কথা বলাতেই বুঝা যাইতেছে যে, ঋতুমতী হইয়া পিতৃগৃহে বাস কন্যার পক্ষে নিন্দনীয়।

"কামমামরণাৎ তিষ্ঠেদ্‌গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেৎ তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥" মনু ৯।৮৯।

উৎকৃষ্ট বর পাইলে, কন্যাকে অল্প বয়সেই দান করিবে, গুণহীন বরে কখনই দান করিবে না বরং ঋতুমতী হইয়া চির-কাল ঘরে থাকুক—এই তিন কথায় বুঝা যায় যে,সাধারণত মধ্যম রাশি বরে সদ্য-সম্ভাবিত-ঋতু কন্যাকে যথাবিধি দান করিবে। ৩০ বৎসরের পাত্র,বার বৎসরের হৃদ্যা কন্যাকে বিবাহ করিবে—এ স্থলে হৃদ্যা বিশেষণে বোধ হয়, কন্যাকে বার বৎসরের পরই সদ্য-সম্ভাবিত-ঋতু বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। রস-গ্রীষ্ম-প্রধান বঙ্গদেশে এখনও সেইরূপ সময়েই ঋতুর কাল বলিয়া বোধ হয়।

দ্বিজাতির বিবাহের কাল-নিয়ম একরূপ মোটামুটি বুঝা গেল। তবে এই সঙ্গে আর একটি কথা আছে—জ্যেষ্ঠের বিবাহ না হইলে,কনিষ্ঠ কখনই বিবাহ করিবে না ; তবেই প্রাপ্ত কাল হইলেই যে বিবাহ করিতে পারিবে, এমন নহে ; কাল বিলম্ব করিতে হইবে। বোধহয় জ্যেষ্ঠ চির-ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলে, এ বিধি খাটে না।

এই কাল-নিয়মের স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, যথাসাধ্য বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া পুরুষ সদ্য-সম্ভাবিত-ঋতু বালিকার পাণিগ্রহণ করিবে। ইহাতে গর্ভাধানের নিয়ম কি তাহা এখনও জানা যায় নাই। বিবাহ-কালের এই নিয়ম এখনও চলিতেছে বলিতে হইবে, অথবা চলিবার কোন বাধা দেখা যায় না। সুতরাং

অনর্থক আমরা বয়ো-নিয়ম লইয়া গোল করি কেন? ডাক্তারেরা বলিতে পারেন, গর্ভাধানের সময়ের পক্ষে বালিকার বয়স প্রচুর নহে; কিন্তু তাহার জন্য বিবাহের কাল নিয়ম লইয়া আমরা গোল করি কেন? গর্ভাধানের সময় পুরুষ যদি আধুনিক বিজ্ঞানের বা অবিজ্ঞানের মত রক্ষা করিতে চান, তাহা হইলে, তাঁহার ত সে বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা এখনকার দিনেও আছে।

শ্রুতির পরেই মনুসংহিতা হিন্দুদিগের সর্ব্বপ্রধান শাস্ত্র। বিংশতি জন ঋষি আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র প্রয়োজক। মনুর সহিত অন্য সকলের মত-বিরোধ হইলে, মনুর মতই আমাদের অনুসরণ করিতে হইবে, ইহাও শাস্ত্রের অনুশাসন-বাক্য,—সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মনুপ্রযুক্ত বিবাহের নিয়মগুলি প্রাঞ্জল, পরিষ্কার, প্রশস্ত এবং উদার। আমরা দেখাইলাম যে, সেই সকল নিয়ম অনুসরণ করিলে, এখনকার দিনে সচ্ছন্দে চলিতে পারে—প্রায় কিছুই ভাঙ্গাগড়া করিতে হয় না। কোনরূপ সামাজিক বিপ্লবই সংঘটিত করিতে হয় না। আসল কথা, আমরা সরল ভাবে, শাস্ত্র, বিজ্ঞান বা যুক্তি কোন কিছুরই অনুসরণ করিতে প্রস্তুত নহি, আমরা এখন কাজেই নিয়ত বিড়ম্বিত হইতেছি।

যে যাহা কিছু বলিবে, তাহাতে অন্যের আপত্তি আছেই আছে। আপত্তি না করিলে, ঘর্ষণ, মর্ষণ কোন কিছুই হয় না। ঘর্ষণ, মর্ষণ না করিলে অগ্নির উৎপত্তি হয় না। সমাজে

যদি আগুণ উঠাইতেই না পারিলাম, তাহা হইলে এ জীবনেও ধিক্, এ লেখনেও ধিক্, এ বচনেও ধিক্! সুতরাং আপত্তি করিতেই হইবে, আগুণ উঠাইতেই হইবে। আমরা বলি ভাই! আগুণ উঠাইলে, কিন্তু সে আগুণ রাখিতে পারিবে না—তোমার ত শোলা ধরাণ নাই। আর এক কথা—কঠোর প্রস্তরে, কঠিন লৌহে ঠকাঠক্ করিলে, তবে আগুণ উঠে; পোড়ান পুরাণ ভাঁড়ে আর কাঁচা নূতন ভাঁড়ে ঠকাঠকি করিলে ভাঁড় দুইটাই চূর্ণ হইবে মাত্র।

মনুসংহিতার সহজসাধ্য, সমাজসঙ্গত, যুক্তিপূর্ণ, উদারতাপূর্ণ বিবাহের কাল-নিয়মে, তুমি আমি বলিলেই, তাহাতে উঁহার তাঁহার আপত্তি আছে। বঙ্গের সম্ভ্রান্ত পরিবারসকলের মধ্যে মনুর ব্যবস্থিত কন্যার বিবাহকাল-নিয়ম সহজেই প্রতিপালিত হইতে পারে, সমাজের গতিও বোধ হয় সেই দিকে—কিন্তু তথাপি সেই নিয়মের কথা তুমি আমি, যে কেহ স্পষ্ট করিয়া বলিলেই, উঁহার তাঁহার আপত্তি আছে। তাহার প্রথম কারণ, আপত্তি করাই অভ্যাস; দ্বিতীয় কারণ, ভাল-মন্দ, সঙ্গত-অসঙ্গত,—কোনরূপ নিয়ম মানিতেই আমরা প্রস্তুত নহি।

কন্যার বিবাহকাল-নিয়ম সম্বন্ধে মনুর ব্যবস্থায় দেখা যাইতেছে যে, প্রবীণ নবীন—উভয় সম্প্রদায়েরই আপত্তি আছে। মনু বয়সের দৃষ্টান্তস্থলে পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন "দ্বাদশ বার্ষিকীং"। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিশেষণ দিয়াছেন 'হৃদ্যাং'—"হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং"। এই হৃদ্যা বিশেষণটি যে কেবল

পাদপূরণার্থ বসিয়াছে, এমন বোধ হয় না। হৃদ্যা শব্দের সার্থকতা আছে,—কাহার হৃদ্যা ? না,—৩০ বৎসরের বরের। এখনকার ভাষায় বলিতে হইলে, বলিতে হইবে—বার বছরের বেশ সেয়ানা মেয়ে। যাহার মনে অনুরাগের সঞ্চরণ সম্ভব, তাহাকেই বিদ্যাপতি 'সেয়ানী' বলেন। গৃহিণীরাও সেইরূপ কন্যাকে সেয়ানা বলেন। এরূপ সেয়ানা মেয়ে না হইলে ত্রিশ বৎসরের বরের হৃদ্যা হইতে পারে না। সুতরাং বুঝিতে হইতেছে যে, 'দ্বাদশবার্ষিকীং' পদের ভাবার্থ পরিস্ফুট করিবার জন্যই হৃদ্যা পদের প্রয়োগ হইয়াছে।

মনুর শ্লোকটি সম্বন্ধে আর একটি কথা বুঝা আবশ্যক। দ্বাদশবার্ষিকী পদের অর্থ কি ? এগার হইতে বার বছরের ? না বার হইতে তের বছরের ? হৃদ্যা শব্দের সার্থকতা বুঝিলে এবং শ্লোকের অপর অর্দ্ধে 'অষ্ট' পদ আছে, 'অষ্টম' এরূপ পদ নাই, ইহা দেখিলে এইরূপ মনে হয় যে, পূর্ণ বার বৎসর-বয়স্কা কন্যার কথাই মনু বলিয়াছেন।

মনুর এই মতে প্রবীণের আপত্তি এই যে, 'তা হ'লে মেয়ের বয়স বড় বেশী হয়।' নবীনের আপত্তি এই যে, 'তা হ'লে মেয়ের বয়স বড় কম হয়।'

রহস্যের কথা এই যে, প্রবীণেরা মনুর মত খণ্ডন করিবার জন্য 'শাস্ত্রের' দোহাই দিয়া থাকেন! শাস্ত্রবাদীর ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা আর নাই।

বিবাহ সম্বন্ধে ভৃগুপ্রোক্ত মনুসংহিতার সমগ্র প্রধান ব্যবস্থা

আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি। তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, মনুর মতে কন্যার বিবাহের বাঁধা বাঁধি কিছু কাল-নিয়ম নাই, 'বরং ঋতুমতী হইয়া পিতৃগৃহে থাকুক' ইত্যাদি বলাতেই ঋতুকালের পূর্ব্বেই কন্যার বিবাহের প্রশস্ত কাল বলিয়া উপলক্ষণা করা হইয়াছে এবং পরে পূর্ণ আট বছরের হইতে পূর্ণ বার বছরের পর্য্যন্ত বয়সের কন্যা বিবাহ-যোগ্যা এরূপ দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে।

এই সম্বন্ধে অন্যান্য দুই একটি সংহিতায় কি আছে, তাহা দেখিলে ক্ষতি নাই। দেশে অষ্ট বর্ষে গৌরীদানের ফলশ্রুতি প্রচলিত আছে। আঙ্গিরসী এবং পরাশরী স্মৃতিতে তাহার অঙ্কুর পাওয়া যায়।

অঙ্গিরার বচন ;—

"অষ্টবর্ষা ভবেদ্‌গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥
তস্মাৎ সম্বৎসরে প্রাপ্তে দশমে কন্যকা বুধৈঃ।
প্রদাতব্যা প্রযত্নেন ন দোষঃ কালদোষতঃ॥"

অষ্টবর্ষা কন্যাকে গৌরী, নববর্ষাকে রোহিণী, দশমে কন্যকা ও তাহার পর রজস্বলা বলে। সেই জন্য পণ্ডিতেরা কন্যার দশম বৎসরে বিবাহ দিবেন, তাহাতে আর কাল-দোষ জন্য দোষ হয় না।

এই কথাটি একটু বিস্তারিত করিয়া বুঝিতে হইবে। পূর্ণ আট বৎসর হইতে ৮ বৎসর ১১ মাস ২৯ দিন পর্য্যন্ত গৌরী ; পূর্ণ ৯ বৎসর হইতে ৯ বৎসর ১১ মাস ২৯ দিন পর্য্যন্ত রোহিণী,

দশমে কন্যকা অর্থাৎ দশ বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত কন্যকা; তাহার পর রজস্বলা। এই শ্লোকটি স্পষ্টই পারিভাষিক ; কিন্তু পরিভাষাও বেশ ভাল করিয়া বুঝা যায় না। 'অষ্টবর্ষা' 'নববর্ষা' প্রথমে বলিয়া পরে 'দশমে' বলাতে 'রোহিণী' ও 'কন্যকা' একই বয়সের কন্যাকে বুঝাইতেছে ; অথবা কন্যকা-কাল গণিতের বিন্দুপরিমিত কাল হইতেছে। এইরূপ গোলযোগ দেখিয়াই বোধ হয়, পরাশর ঐ শ্লোকের সংস্করণ করেন।

পরাশরের বচন এইরূপ ;—

> "অষ্টবর্ষা ভবেদ্‌গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
> দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা ॥
> প্রাপ্তে তু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
> মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিবন্তি পিতরঃ স্বয়ং ॥" ৭।৬-৭।

অষ্টবর্ষা কন্যাকে গৌরী, নববর্ষাকে রোহিণী, দশবর্ষাকে কন্যা ও তাহার পর রজস্বলা বলে। দ্বাদশ বৎসর (প্রাপ্ত) হইলে, যে কন্যাদান না করে তাহার পিতৃলোকেরা ইত্যাদি।

দেখা যাইতেছে যে, পরাশর অঙ্গিরার গোলযোগের সংস্করণ করিতে গিয়া মনুর পথেই অগ্রসর হইয়াছেন। ঘুরে ফিরে দ্বাদশ বৎসরে আসিয়া পড়িয়াছেন। বাস্তবিক 'অষ্টবর্ষা ভবেদ্‌গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী' এই আধখানা বচন যদি বজায় রাখিতে হয়, তাহা হইলে 'দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা' এইরূপ না বলিলে চলে না। সুতরাং দশ হইতে এগার বৎসর পর্য্যন্ত খাস্ কন্যা-কাল ; তাহার পর অর্থাৎ একাদশ বৎসর পূর্ণ হওয়ার

পর হইতে পারিভাষিক রজস্বলা কাল। এই পারিভাষিক রজ-স্বলা কালে অর্থাৎ কন্যার পূর্ণ এগার বৎসর বয়স হইলে পর তাহার বিবাহ দেওয়া চলবে না কি? চলিবে, কিন্তু এগারর পর বার পূর্ণ হওয়ার মধ্যে দিতে হইবে, ইহার মধ্যে যদি না দাও, তাহা হইলে তোমার পিতৃপুরুষের বড়ই দুর্গতি হইবে। তবেই পরাশরের মতে, দশ হইতে এগার বৎসর পর্য্যন্ত খাস্ কন্যা-কাল, সেই সময় কন্যার বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য; অন্তত এগার হইতে বার বৎসরের মধ্যে কন্যার বিবাহ দেওয়া আবশ্যক।

এই মতের সহিত মনুর মতের বিশেষ বিরোধ নাই। তবে মহাত্মা মনু কন্যাকর্ত্তাকে সৎপাত্র পাওয়ার দিকেই লক্ষ্য রাখিতে বলেন, কালাকালের বিশেষ নিয়ম করেন নাই, এই মাত্র। আমরাও বলি, ইহাই সদ্‌বুদ্ধির কথা, ইহাই শাস্ত্র, ইহাই ধর্ম্ম।

দশ বার বৎসরে কন্যার বিবাহ দেওয়ায় নব্য সম্প্রদায়ের আপত্তি আছে। আপত্তি—বৈজ্ঞানিক। নব্য সম্প্রদায়ের অনে-কেই বিবেচনা করেন যে, বিবাহ হইলেই দম্পতির শারীরিক সম্মিলন হইবে। এগার বার বৎসরের বালিকার গর্ভাধান, তাঁহারা বিশেষ অনিষ্টকর বলিয়া বিশ্বাস করেন, কাজেই এগার বার বৎসরের কন্যার বিবাহে তাঁহাদিগের আপত্তি।

আমরা বলি, নব্য সম্প্রদায় ঐরূপ বিবাহে আপত্তি না করিয়া, যদি আপন আপন পুত্র-কন্যার সহিত বধূ-জামাতার বাল্যমিলন নিবারণের যত্ন করেন, তাহা হইলেই ভাল হয়।

যদি বলেন যে, বিবাহ দিয়া বর-বধূর শারীরিক সংঘটন নিবারণ করা অসাধ্য, তাহা হইলে আমরা বলি, যদি সম্পূর্ণ আয়ত্তিগত বধূর সহিত পুত্রের সংঘটন অনিবার্য্য হয়, তাহা হইলে আয়ত্তির একান্ত বহির্ভূত বারবনিতার সহিত পুত্রের অধিগমনও অনিবার্য্য হইবে। যদি বলেন, সৎ শিক্ষায় ও সৎদৃষ্টান্তে বেশ্যাগমন নিবারণ করা যায়, তাহা হইলে আমরা জিজ্ঞাসা করি, সেইরূপ সৎশিক্ষা ও সৎদৃষ্টান্তে কি বাল্য-সংঘটন নিবারণ করা যায় না? অবশ্যই যায়।

কন্যার দ্বিতীয় সংস্কারের পূর্ব্বে যাহাতে বরবধূর সংঘটন না হয়, সে পক্ষে সকলেরই দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। এইরূপ সংঘটন অস্বাভাবিক, অশাস্ত্রীয়, অনাচার। কিছুকাল পূর্ব্বে, এইরূপ সংঘটন গৃহিণীরা পুত্রের অল্পায়ুষ্কর বলিয়া বিশ্বাস করিতেন; দ্বিতীয় সংস্কার না হইলে দ্বিরাগমন হইত না; হইলেও বিবাহের এক বৎসর মধ্যে দ্বিরাগমন হইত না। এক বঙ্গদেশ ছাড়া, উৎকল, উত্তর-পশ্চিম প্রভৃতি সকল দেশেই এখনও দ্বিতীয় সংস্কার না হইলে, 'গহনা' বা দ্বিরাগমন হয় না, বা দ্বিরাগমন না হইলে, কখনই বরবধূর মিলন হয় না। বাস্তবিক তাহাই ধর্ম্ম, তাহাই বিজ্ঞান, তাহাই সদাচার। আমাদের দেশে দেখিতে দেখিতে এই বিষয়ে অনাচার প্রবেশ করিতেছে। সর্ব্বনেশে 'ধূলা পায়ে দিন করা' সমাজমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। এই প্রথার বিস্তৃতি রোধ করিতে হইবে; অস্বাভাবিক সংঘটন নিবারণ করিতে হইবে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

গার্হস্থ্য ধর্ম্ম।

অঋণী।

যুধিষ্ঠির-যক্ষের প্রশ্নোত্তরে আমরা একটি কথা পরিষ্কার-রূপে বুঝিতে পারি। যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কো মোদতে ?' সুখী কে ? ইতিপূর্ব্বে যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে অনেক বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহাতে ধর্ম্মের কথা, বৈরাগ্যের কথা, বিস্তর আছে, এবার ধর্ম্মের বা বৈরাগ্যের প্রশ্ন নহে—গৃহীর সুখ-দুঃখের কথা। সুতরাং যুধিষ্ঠির উত্তর দিতেছেন ;

> "পঞ্চমেঽহনি ষষ্ঠে বা শাকং পচতি স্বে গৃহে।
> অনৃণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে॥" বনপর্ব্ব ৩১২অঃ।১১৫।

যে ঋণগ্রস্ত ও প্রবাসী না হইয়া আপনার গৃহে দিবসের পঞ্চম বা ষষ্ঠভাগে শাক মাত্রও পাক করে, সেই ব্যক্তিই সুখী। তিনটি কথায়, ভারতবর্ষের গার্হস্থ্য ধর্ম্মের তিনটি মূল কথা বিবৃত হইয়াছে। ঋণ না করিয়া সংসার চালান, বিদেশে না গিয়া নিজ গৃহে বাস করা, আর সামান্যে সন্তুষ্ট থাকা—এই তিনটি হইল, ভারতবাসীর গার্হস্থ্য ধর্ম্মের প্রধান কথা।

ঋণ সম্বন্ধে বিদেশের মহাকবি শেক্সপিয়র কি বলিয়াছেন, ভাবিয়া দেখুন—পুত্রকে পিতার উপদেশ-ব্যপদেশে তিনি বলিয়াছেন ঃ—

"Neither a borrower, nor a lender be :
For loan oft loses both itself and friend ;
And borrowing dulls the edge of husbandry."

ঋণদাতা বা গৃহীতা হবে না কখন ;
ঋণ দিলে হেন হয়, অনেক সময়,
বান্ধব-বিচ্ছেদ আর নিজ অর্থক্ষয়।
না থাকে সংযম, ঋণ করিলে গ্রহণ,
কুবেরের ধনে আর হয় না কুলন।

বাস্তবিক ঋণ দুই দিকেই কাটে। ঋণ যে দেয়, যে লয়, প্রায় কাহারও ভাল হয় না। বন্ধুর বা আর কাহারও উপকার করিতে হইলে, যাহা পার সাহায্য কর, কিন্তু ঋণ দিলাম, মনে করিয়া, তাহাকেও বাঁধিও না, আপনিও বাঁধা পড়িওনা।

ঋণগ্রস্ত হইয়া কোন কর্ম্ম করিলে, তাহার ফল পাওয়া যায় না। নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্যে ভিক্ষা করিবে, তবু ঋণ করিবে না ; আর যদি সঙ্গতিতে না কুলায় তাহা হইলে, কাম্য কর্ম্ম একেবারে করিবেই না। ঋণ করিলে মানুষকে যত আত্ম-সম্মান হারাইতে হয়, এত আর কিছুতেই নয়। ঋণী ব্যক্তি সর্ব্বদাই সশঙ্ক, সর্ব্বদাই কুন্ঠিত। উত্তমর্ণের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হইলে, মুখ শুকাইয়া যায় ; বুঝিবা লোকটি পথের মাঝেই

তাগাদা করেন ; উত্তমর্ণের ভবনে উৎসব, তিনি উৎসবে যোগ-দানার্থ নিমন্ত্রণ করিতে আসিলে আশঙ্কা হয়,—এ সময় তাঁহার খরচপত্র হইবে, হয়ত পাওনা টাকার তাগাদা করিবেন। আবার নিজ বাড়ীর উৎসবে, উত্তমর্ণকে নিমন্ত্রণ করিতে যাইতে ভয় হয়,—যদি বলেন, ঋণ থাকিতে এত বড়াবাড়ি না করিলেই ভাল হইত। জামাই-বেহাই বাড়ীতে আসিলে, বাজার হইতে একটা বড় ইলিশমাছ কিনিবার ইচ্ছা হইলেও কিনিবার উপায় নাই,—মহাজনের বাড়ীর কাছ দিয়া আসিতে হইবে যে। টানা-টানি করিয়া সংসার চালাইয়াও স্বস্তি নাই। তিনি শুনিয়া যদি বলেন, "ওহে ভাই, এত কষাকষি করিয়া সংসার চালাই-তেছ, ভালই ; আমার টাকা কটা ফেলিয়া দাও না।" এইরূপে দেখা যায় ঋণ করিলে, খাইতে শুইতে, উৎসবে ব্যসনে, আহারে বিহারে—কিছুতেই স্বস্তি পাওয়া যায় না ; কেবল কর্ম্ম-ভোগ ভুগিতে হয়, কর্ম্মের সুফল মিলে না। জমীদার মহাশয় ঋণগ্রস্ত ; দেখিবে, তিনি যখন হাসিতেছেন তখন তাঁহাকে বিকারের রোগী বলিয়া মনে হইতেছে,—এমনই বিকৃত বদন-ব্যাদান, এমনই উচ্চ ধ্বনি, এমনই হস্তপদের আস্ফালন। তাঁহার নিজ প্রভুপরায়ণ ভৃত্য-মুহুরি, তাঁহাকে হিসাব দেখিতে বলিলে, তিনি চটিয়া লাল হন ; কখন মনে করেন, ঋণ আছে বলিয়া কর্ম্মচারী বিদ্রূপ করিতেছে, কখন মনে করেন, মহা-জনের টাকা খাইয়া তাহার ঋণ পরিশোধ করিবার পরামর্শ দিবে। এইরূপে দেখিবেন ঋণের বাড়া বিড়ম্বনা আর নাই।

সততই মনে হয়, মহাজন যেন বুকের উপর বসিয়া আছে। বুকের উপর যেন জগদ্দল পাথর চাপান আছে। এমন যে সন্ধ্যা আহ্নিক, দেব-পূজা—তাহাতেও শান্তি আসে না। মহাদেবের রত্নকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং ভাবিতে গিয়া, মহাজনের ভ্রূকুটি-কুটিল-কটাক্ষ মনে পড়ে। ধ্যান-পূজা সমস্ত পণ্ড হইয়া যায়। যদি সুখ, স্বস্তি, শান্তি চাও, তবে ঋণী হইওনা, ঋণ না করিয়া যেরূপে পার সংসার চালাইবার চেষ্টা কর।

এখনকার দিনে এই উপদেশের সম্পূর্ণ বিপরীতাচরণ সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়। কোটাবাড়ী দালান না হইলে, এখন সহর অঞ্চলে ভদ্রলোক হওয়া যায় না। আর ঋণ না করিয়া নগদ দামে চূণ-সুরকী-ইট কিনিতেই নাই। কাজেই সহর ও সহরতলীর ভদ্রলোক মাত্রেই ইট-চূণ-সুরকার মহাজনের কাছে ঋণী। তাহার পর নগদ দাম দিয়া, যে কাপড়-চোপড় কেনে, তাহাকেও ভদ্র বলা প্রথা নয়—সুতরাং কাপড়ের দোকানের ঋণ থাকাই প্রশস্ত; কাজেই এখন লোকে, অকুলানের দায়ে না হইলেও, ভদ্রতার দায়ে ঋণী হইতেছে। তাহার পর এখন একটা 'ব্যবসা' বলিয়া কথা উঠিয়াছে। তা নাকি ঋণ করিয়া করাই উচিত। ৮৲ টাকা হারে সুদ কবুল করিয়া, বাস্তুবাড়ী বন্ধক দিয়া, কাটা কাপড়ের কারবার করিলাম; তাহাতে ১২৲ টাকা করিয়া লাভ পোষাইবে সুতরাং খামকা ৪৲ টাকা করিয়া লাভ থাকিবে,—জানিয়া শুনিয়া এমন লাভ ত্যাগ করা নির্বুদ্ধিতা। সুতরাং ঋণ করাই সুবুদ্ধির পরামর্শ।

আমরা সহর অঞ্চলের কথা বলিতেছি বলিয়া, এমন মনে করিতে হইবে না যে, পল্লীগ্রামে ঋণ কম। অধিকাংশ পুরাতন সম্ভ্রান্ত পরিবার এখন ঋণদায়ে উদ্বাস্তু হইয়াছেন। যদি তাহার মধ্যে দুই এক জনের ভাল চাকরি জুটিল, তবেই কথঞ্চিৎ রক্ষা,—নতুবা ঋণ বাড়িতে বাড়িতেই চলিল।

শেক্সপিয়র সুন্দর বলিয়াছেন, ঋণ করিতে শিখিলে আর মিতব্যয়িতা-প্রবৃত্তির তীক্ষ্ণতা থাকে না, ভোঁতা হইয়া যায়। মিতব্যয়িতা হইল গার্হস্থ্য ধর্ম্মের প্রাণ। মিতব্যয়িতা নষ্ট হইলে,সংসারের আর প্রাণ থাকে না—সমস্ত শিথিল হইয়া যায়।

আমাদের মত মধ্যবর্ত্তী লোকের মিতব্যয়িতা থাকিলে সংযম থাকে, মিতাচার থাকে, বিলাসিতা কম থাকে, আড়ম্বর কম থাকে, পরিবারস্থ স্ত্রীপুরুষের পরিশ্রমে অভ্যাস থাকে; আর ঋণ করিতে শিখিলে, বিলাসিতা আসে, আলস্য আসে, সংযম থাকে না—লক্ষ্মী ছাড়া হইতে হয়।

ধনবৃদ্ধির জন্য ঋণ, মানবৃদ্ধির জন্য ঋণ, বিলাসবৃদ্ধির জন্য ঋণ—নানারূপ ঋণে বাঙ্গালার গৃহস্থগণ নষ্ট হইয়া যাইতে-ছেন। অর্থাভাবে ঋণই কিন্তু বেশী। প্রয়োজনীয় পদার্থের সংগ্রহ হয় না, সেইজন্য সামান্য আয়ের ভদ্রসন্তান বাধ্য হইয়া ঋণ করেন। আয়ের দশাংশের এক অংশ সঞ্চয়ের জন্য রাখিয়া, নয় অংশ ব্যয় করিলে, তবে গৃহস্থালি হয়, একথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। প্রথমত দুইটি কারণে ঐ উপদেশ আমরা গ্রাহ্য করি না,—

(১) পোষাক-পরিচ্ছদের সহিত মান-সম্ভ্রমের সম্বন্ধ আছে, এইরূপ মনে করিতে আমরা শিখিতেছি।

(২) আর শিখিতেছি, খাওয়া-দাওয়া, পোষাক-পরিচ্ছদের চালচলন ক্রমে ক্রমে বাড়ান কর্ত্তব্য, তাহা হইলে অধিকতর অর্থোপার্জ্জনের প্রয়োজন হয়; প্রয়োজন হইলেই প্রয়োজন মিটাইবার উপায় অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্তি হয়; উপায় ক্রমে বাহির হইয়া পড়ে; কাজেই আয় বাড়িয়া যায়।

(১) আমরা যদি পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া সম্মান করিতে, সম্ভ্রম করিতে, মর্য্যাদা করিতে শিখি, তাহা হইলে সমাজে ঘোর অনর্থপাতের সূত্রপাত করি। ধনবান লোকেই আড়ম্বরে পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে পারেন; কেবল পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া সম্মান করিলে, কেবল ধনবানেরই সম্মান করা হয়। যে সমাজে কেবল ধনবানের সম্মান আছে, সে সমাজ অতি অপকৃষ্ট সমাজ।

সমাজে গুণের ও কর্ম্মের সম্মান থাকা আবশ্যক। গুণকর্ম্ম-বিভেদেই জাতিভেদ হইয়াছিল। এ বিষয়ে এখানে এই পর্য্যন্ত।

(২) প্রয়োজন বাড়াইলেই আয় বাড়ে। ঘোর মিথ্যা কথা। প্রয়োজন বাড়াইয়াছি বলিয়াই আমরা ঋণগ্রস্ত হইতেছি, ইহার দৃষ্টান্ত পাইবার জন্য আমাদিগকে অধিক কষ্ট পাইতে হইবে না। ঘরে ঘরেই ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। এখনকার দিনে এত যে হাহাকার, প্রয়োজন বৃদ্ধি তাহার মূল কারণ। ছোট ছেলে—নিজে ভাল মন্দ কিছুই বুঝেনা,

তাহার একখান 'নটুন কাপল' ও 'আঙ্গা জুতো' হইলেই মহা-খুসী, আমরা কিন্তু বাঁকড়ি লাগান শাটীনের জামা, চীনের জুতা তাহাকে দিবার জন্য বিব্রত। কাজেই আমরা ঋণদায়ে অষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত।

এই সকল বিলাস দ্রব্যের মায়া কাটাইয়া আমাদিগকে আবার হিন্দু সংসারী হইতে হইবে। তাহা হইলে স্বস্তি পাইব, শান্তি পাইব। সংসারে আবার শৃঙ্খলা স্থাপিত হইবে। আয়ে ব্যয়ে যে সামঞ্জস্য সাধন, তাহাই হইল, সংসারের শ্রেষ্ঠ শৃঙ্খলা। সেই শৃঙ্খলা হারাইয়া আমরা ভগ্ন-কর্ণ নৌকার মত এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। প্রত্যহ পসারীর কাছে ঋণ করিয়া নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষপত্র আনি বলিয়া, আমরা ভাল জিনিষ পাইনা, আর মাসকাবারের দিনে ডাহিনে আনিতে বামে কুলায় না; কোন জিনিষে কিছুতেই আয় দেয় না; সদাই অনাটন; আমরা লক্ষ্মীর সন্তান হইয়াও দিন দিন নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়া হইতেছি।

অপ্রবাসী।

যুধিষ্ঠিরের কথা,—অপ্রবাসী হইলে তবে সুখী হইতে পারা যায়। প্রবাসে কি সুখ পাওয়া যায় না? যুধিষ্ঠির কিরূপ সুখের কথা বলিতেছেন, তাহা বুঝিলে, তবে ঐ কথার উত্তর দেওয়া যায়। অঋণী ব্যক্তিই সুখী হইতে পারে, এই কথা বলাতেই আমরা কতক কতক বুঝিতে পারিয়াছি যে, তিনি স্বস্তির কথা, শান্তির কথা লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন।

এখন বুঝিতে হইবে, কোন্ বিষয়টি লক্ষ্য করিয়া, তিনি 'প্রবাস' দুঃখের হেতুভূত মনে করিয়াছেন।

বংশপরম্পরাক্রমে একই দেশে থাকিয়া, কি জীব-জন্তুর, কি গাছ-পালার—সেই দেশের জল-বায়ুর সহিত, তাপ-মৃত্তির সহিত—এক প্রকার সখ্য বা সৌহার্দ্দ্য হয়। এ দেশের কলাগাছ পশ্চিম মুলুকে বসাইলে, মুশ্‌ড়াইয়া যাইতে থাকে, কিছু দিনে মরিয়া যায়। পশ্চিমের ময়ুয়া পাখী দুই বৎসর বাঁচাইয়া রাখা দায়। সকলেই জানেন, হাতী, উট, ঘোঁড়া—সকল দেশে জন্মায় না, লইয়া আনিয়া রাখিলেও স্বদেশের মত উহাদের বংশবৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি হয় না। মানুষের বেলায়ও ঠিক সেই ভাব। পুত্রের পীড়ার দায়ে, পশ্চিমোত্তর প্রদেশের ইটাওয়া নগরে পাঁচ মাস প্রবাস করিয়াছিলাম; প্রবাসী বাঙ্গালিদের সঙ্গে আলাপ করিয়াছিলাম। সেখানে এক পুরুষে বা দুই পুরুষে বাঙ্গালির বাস অধিক,—এক ঘর চারি পাঁচ পুরুষে ছিলেন। তাঁহাদের নিবাস ছিল হালিসহরে, বোধ করি তাঁহারা খনের চাটুতি; সরকারের প্রথম অবস্থায়, ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ ভাল চাকরি লইয়াই আসেন, ঐ জেলায় প্রায় বার্ষিক ছয় হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি করেন। আমার সহিত যখন উঁহাদের আলাপ হয়, তাঁহার পৌত্র তখনও জীবিত ছিলেন, অন্ধ হইয়াছিলেন। পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, পৌত্রাদি অনেক গুলি—কিন্তু কি বলিয়া তাঁহাদের অধঃপতন বুঝাইব, তাহা বলিতে পারি না।

পশ্চিমের আফিং খাওয়া, বাঙ্গালির মোকদ্দমা করা, এই দুইটা রোগ একত্র মিশ্রিত হইয়া, তাঁহাদিগকে কি যে বানাইয়া তুলিয়াছে, তাহা বর্ণন করা যায় না। তাঁহাদিগকে বাস্তবিকই মানুষ বলিতে কুণ্ঠা হয়,—পাছে বাকি মানুষে মানহানির দাবি করে। ইটাওয়া হইতে কানপুরে আসি—সেখানে একটি খাঁটি বাঙ্গালি-পাড়াই আছে। অতি অপরিষ্কার পল্লী; অধিবাসীদের অবস্থা সর্ব্ব বিষয়েই শোচনীয়। তাহার পর প্রয়াগে আসিলাম—সেখানে দুই জন গণ্যমান্য শিক্ষকের সহিত এই বিষয়ে আমার কথাবার্ত্তা হইল। একজন শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, 'প্রবাসীর' সম্পাদক, আজ কাল প্রবাস পরিত্যাগ করিয়াছেন, আর একজন শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ঘোষ, গবর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যাপক, এখনও সেই পদেই আছেন। দুই জনেই এক বাক্যে বলিলেন যে, তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, স্বকৃত প্রবাসীর পুত্র-পৌত্র পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানী বালক-যুবকদের অপেক্ষা ভাল থাকে, কিন্তু কোন প্রবাসী বাঙ্গালির প্রপৌত্র হিন্দুস্থানীদের সমকক্ষতাও রক্ষা করিতে পারে না। বুঝিলাম, প্রবাসে বংশের অবনতিই হইয়া থাকে।

আর এক কথা—দেশে আমরা ৫০ ঘর প্রতিবেশী, আজি দুই শত বৎসর যাবৎ একস্থানে একত্র বাস করিতেছি; সকলের দোষ গুণ, সকলে জানি; দোষ-গুণ জানিয়া, সেই মত ব্যবহার করিয়া থাকি। প্রতিবেশিমণ্ডলী একরূপ একটি বৃহৎ পরিবার হইয়া পড়িয়াছে; পরস্পরের সুখ-দুঃখে পরস্পর

জড়িত থাকে—বিপদে সাহায্য পাই, উৎসবে আনন্দ পাই। কোন্ ভাবে কে সাহায্য চায়, তাহা জানি, কাহাকে কি ভাবে সাহায্য করিতে হইবে, তাহা বুঝি।

বিদেশে ইহার কিছুই হয় না। যদি পঞ্চাশ ঘর বিদেশীর মধ্যে আমি এক ঘর রহিলাম, তাহা হইলে ত আমাকে বনবাসের অপেক্ষাও কষ্টে থাকিতে হইবে। তা না হইয়া যদি পঞ্চাশ ঘরের মধ্যে আমরা দশ ঘর বাঙ্গালি থাকি, তবুও বিড়ম্বনা বড় কম নয়। আমরা দশ ঘর বাঙ্গালি বটে—কিন্তু তাহার মধ্যে দুই ঘর বা শ্রীহট্টী, তিন ঘর বরিসালী, দুই ঘর বর্দ্ধমানী, দুই ঘর কলিকাতার। সভ্যতার পালিশের গুণে হয় ত এক প্রকার সৌজন্য আছে, কিন্তু সৌহার্দ্দ্য এক বারেই অসম্ভব। তুমি হয় ত দুইটি রোগা ও রোগী ছেলে, বৃদ্ধ মাতা ও যুবতী ভার্য্যা লইয়া চাকর বামন সম্বল করিয়া প্রবাসে পড়িয়া আছ। দেখিবে প্রবাসে বাঙ্গালির মধ্যে সৌজন্যের অভাব নাই। প্রভাতে পরিক্রমের সময়, দেখিবে দলে দলে বাঙ্গালি বাবুরা আসিয়া কেবল (kind enquiry) সৌজন্য সহকারে তত্ত্ব লইতেছেন, জ্বর কত ডিগ্রী উঠিয়াছিল সকলেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কিন্তু এই যে আপনারা আগন্তুক দম্পতী, রোগের সেবায় ক্রমাগত রাত্রি জাগিয়া মারা যাইতে বসিয়াছেন, কোন রূপ সাহায্য করিয়া আপনাদের একটু 'আশান' দিবার প্রস্তাবও কেহ কখন করিবেন কি? তাহা করিবেন না। প্রবাসে হৃদয়ের টান প্রায়ই হয় না,

তাহার উপর ইংরাজি সভ্যতার একটা মোহ হইয়াছে, ভদ্র লোকে মনে করেন সৌজন্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলেই মনুষ্যত্ব রক্ষা হয়। পরস্পর সাহায্যে মনুষ্যত্ব; ঘাড় নাড়া-নাড়ি বা হাত নাড়া-নাড়ি, একত্র তামাক খাওয়া বা চা পান করায়—মনুষ্যত্ব হয় না। যতই দয়ার ভাবে খোজ খবর লও, তাহাতে মনুষ্যত্ব হয় না—দয়ার বা প্রীতির বা মৈত্রীর কার্য্য করা আবশ্যক। প্রবাসে সকলেই যে মনুষ্যত্বহীন, এমন কথা বলি না, মনুষ্যত্ব থাকিলেও পাঁচজনের মধ্যে বংশপরম্পরায় ঘনিষ্ঠতা না থাকায়—মনুষ্যত্ব ফুটে না, বরং শুকাইয়া যায়।

মহাভারতের সময়ে প্রবাসে সুখ ছিল না, অপ্রবাসী হইলে, তবে সুখের সম্ভাবনা ছিল; এখন আমরা সর্ব্বত্র সুখ হারাইতে বসিয়াছি, সুতরাং কথাটা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে না। আপনি আর পত্নী—এই লইয়া যদি আমরা সংসারী হই, তাহা হইলে আমাদের সর্ব্বত্রই সমান। কেননা তাহা হইলে বুঝিতে হইবে আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্ব ভুলিয়া গিয়াছি বা ত্যাগ করিয়াছি। পূজা-অর্চ্চনা—অতিথি-পথিক—ঠাকুরসেবা, গো-সেবা—প্রতিবেশী পাঁচজন—লইয়া সম্পদে, বিপদে, আপদে, উৎসবে—সমানে সুশৃঙ্খলার সহিত জীবনযাত্রার যে মনুষ্যত্ব—সে মনুষ্যত্ব হইতে আমরা বঞ্চিত হইয়াছি।

প্রবাসে এক শূকর-পেটের পূরণ আর, মিত্র বা আমিত্র ভোজে, খাসী-চর্ব্বির খানায় দানবোদরের সম্পূরণ—ছাড়া ক্রিয়া কলাপ কিছুই নাই। পূর্ব্বপুরুষ-প্রতিষ্ঠিত শালগ্রাম

শিলা আছেন—পুরোহিত ঠাকুরের ভাঁড়ার ঘরের কুলুঙ্গিতে, দুধল গাই আছেন—গোয়ালার গোয়াল ঘরের দাওয়ায়, বড় বাড়ী দেখিয়া বাড়ীর ধারে রোয়াকে অতিথি চীৎকার করিতেছে, —ডেপুটী বাবু তখন প্রবাসে চায়ে চিনি কম হইয়াছে বলিয়া চাপরাসীকে ভর্ৎসনা করিতেছেন। দেশের লোকের খোজ খবর নাই, পিতৃপুরুষদের সঙ্গে সম্পর্ক নাই, দেবতা-ব্রাহ্মণে ভক্তি নাই—পূজা নাই, অর্চ্চনা নাই,—শ্রাদ্ধ নাই, শান্তি নাই—প্রবাসে হিন্দুর মনুষ্যত্ব কেমন করিয়া থাকিবে? না—আমরা পেটের দায়ে, অবস্থা-উন্নতির দায়ে, রোগের দায়ে, সকের দায়ে—কারণে, অকারণে প্রবাসী হইয়া প্রকৃত মনুষ্যত্বের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত সুখ হারাইতেছি।

সংসারীর সুখ-সচ্ছন্দতা, স্বস্তি-শান্তি,—সকলই আর পাঁচ জন সংসারী লইয়া। প্রতিবেশীর বংশের রীতি নীতি জানিলে, তবে তাঁহাদের সঙ্গে সামাজিক ব্যবহারে সুখ পাওয়া যায়। প্রবাসে একজন আর এক জনের বংশের পরিচয় কিছুই জানেন না; কাজেই পরস্পরে পরস্পরের বংশপরম্পরার পরিচয়ে যে ঘনিষ্ঠতা দেশে হয়, প্রবাসে তাহার কিছুই হয় না। এটি গেল সাধারণ কথা। আবার বিশেষ কথাও আছে। সক করিয়া যাঁহারা প্রবাসী হন, তাঁহাদের মধ্যে দেশে দুষ্কর্ম্ম করিয়া বিদেশে আশ্রয় লইয়াছেন, এমনও দুই এক জন থাকেন। তাঁহাদের সহিত আলাপ পরিচয় করিতে যাওয়া মহা বিড়ম্বনা। তাঁহারা সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকেন, সর্ব্বদাই মনে করেন,

এ ব্যক্তি বুঝি আমার দেশের সংবাদ রাখে ; কাজেই দেশের কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেই চটিয়া লাল হন ; লোকটা হঠাৎ কেন এমন করিল ভাবিয়া বিড়ম্বিত হইতে হয়। এইরূপ ভাবিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, প্রবাসে নানারূপ বিড়ম্বনা অবশ্যম্ভাবী। প্রবাসে যাওয়া বা থাকা যত কমান যায়, ততই ভাল। ব্রহ্মচর্য্য-অবস্থায় গুরুর সহিত বিদেশভ্রমণ, গৃহস্থ অবস্থায় তীর্থপর্য্যটন, (এখন আশ্রমভেদ নাই বলিলেও হয়, কিন্তু) বাণপ্রস্থের মত সময়ে প্রবাসে পর্য্যটন, আর দেশে মহামারী আদি হইলে, প্রবাসে অগত্যা বাস,—এই সকল সময় ছাড়া, বাঙ্গালির পক্ষে স্বেচ্ছায় অনর্থক প্রবাসবাস একেবারে পরিবর্জ্জনীয়।

স্বগৃহে পাক।

অঋণী-অপ্রবাসী হইয়া, যে ব্যক্তি আপনার গৃহে অতি যৎসামান্য খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে—সেই সুখী। দুইটি কথা লক্ষ্য করিবার আছে ; (১) একবার 'অপ্রবাসী' বলা হইয়াছে, আবার 'স্বে গৃহে' বলা হইয়াছে। কেবল দেশে থাকিলে হইবে না, আপনার একটি গৃহ থাকা চাই। আমাদের রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণদিগের একটা নিন্দার কথা ছিল, "নিবাস শ্বশুর ঘরে"। সেরূপ অপ্রবাসী হইলে চলিবে না —সত্য সত্যই নিজের একটি ঘর থাকা চাই। এমন কেহ মনে করিবেন না, ইহাতে একান্নবর্ত্তী পরিবারে বাস করা নিষিদ্ধ হইতেছে। তাহা নয় ; যে ভাবে আমরা বলি, "পর

ভাতী ভাল, পর্ ঘরী কিছু নয়”—এ সেই ভাবের কথা। গৃহী মাত্রেরই গৃহ থাকা চাই—এবং গৃহিণীও থাকা আবশ্যক। কিন্তু সে কথা যুধিষ্ঠিরের উত্তরে স্পষ্ট করিয়া নাই, আমরাও বলিব না। গৃহে গৃহিণী থাকা চাই—এ উপদেশ বাঙ্গালিকে দিবার প্রয়োজন নাই। অতি সামান্য আয়ের কেরাণী বাবুও এখনকার দিনে পরিবার নিকটে রাখিবার জন্য ব্যগ্র, কাজেই ও কথা বলার প্রয়োজন নাই। আর, লক্ষ্য করিবার কথা ‘পচতি’—পাক করে বা প্রস্তুত করে। দিনান্তে একবার মাত্র হউক, অতি যৎসামান্য হউক, তাহা যদি সে প্রস্তুত করিতে পারে, তবেই সে সুখী; ‘খাইতে পাইলে সুখী’ এমন কথা নাই। কেননা খাওয়াটা গৃহস্থালীর বড় জিনিষ নয়; পাক করিবার ক্ষমতা থাকা গৃহস্থের লক্ষণ, তবেত দেবতা-অতিথিকে দিয়া আহার। সুতরাং পাক করা চাই।

যুধিষ্ঠিরের উত্তরে বুঝা গেল, দরিদ্রের কুটীরে পর্য্যন্ত সুখ থাকিতে পারে। তাহার ঋণ না থাকিলেই হইল, (জন্ম ভূমিতে) একখানি স্থায়ী কুটীর থাকিলেই হইল, এবং দিনান্তে একবার হাঁড়ী চড়িলেই হইল। সুখ ভোগে নহে, সুখ ঐশ্বর্য্যে নহে, সুখ ভোগ বিষয়ের প্রাচুর্য্যে নহে। এইটি ভারতের একটি মূল কথা। ঋণ করিয়া ভোগের আড়ম্বরের কথায় আমরা এই কথারই আলোচনা করিয়াছি। আবার সেই কথারই তোলাপাড়া করিতেছি।

সন্তোষ।

আমরা বলি সন্তোষ সুখের মূল। বিদেশীয়েরা বলেন, সন্তোষ সকল দুঃখের আকর। সন্তোষ হইতে আলস্য আসে, আলস্য হইতে অভাব-মোচনের শক্তি কমিয়া যায়, অভাব-গ্রস্ত হইয়া আমরা নানা দুঃখ পাই। সুতরাং কি রাজ-নীতিতে, কি সমাজনীতিতে অসন্তোষই হইল উন্নতির উপায়। কিন্তু যাঁহারা এইরূপ অসন্তোষের উপদেশ নিয়ত দিয়াছেন, তাঁহারাই এখন একটু ইতস্তত করিতেছেন। এখন রাজনীতি ক্ষেত্রে ভারতে মহা অসন্তোষ দেখিয়া,তাঁহাদের চক্ষু ফুটিয়াছে। বলিতেছেন, এরূপ অসন্তোষ ভাল নহে। আমরা রাজনীতির কথা তুলিব না; তবে সমাজে অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়া বা বৃদ্ধি করিয়া যাঁহারা সমাজের মঙ্গল-কামনা করেন, তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তির বা প্রকরণপদ্ধতির প্রশংসা করিতেও পারিব না। অসন্তোষ—অধর্ম্ম। অধর্ম্মে কোন সমাজের বা ব্যক্তির বা পরিবারের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে, এমন কথা বুঝিতে পারি না।

বালকে আপনাদের অবস্থা বুঝে না, কাজেই সর্ব্বদা "ইহা কই, উহা কই, ক্ষীর খাইব, মিঠাই খাইব" বলে। বালকের সেই অসন্তোষে প্রশ্রয় দিয়া, তাহাকে অসন্তুষ্ট যুবা করিতে পারিলেই কি সুবুদ্ধিমানের কাজ হয়? না সেই বালককে বুঝাইতে হইবে যে,—"বাপু আমরা ক্ষীর-মিঠাই কোথা পাইব? যার যেমন সঙ্গতি, তাহার ছেলেপিলেরা সেই মতই খাইতে পায়,—আমাদের যেমন অবস্থা, সেই মত অবস্থাতেই

সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। তোমার জন্য মোয়া আছে, লাড়ু আছে, তাহাই খাইয়া সন্তুষ্ট হও।” যে, যে অবস্থার লোক হওনা কেন, সন্তোষ সকলকেই শিখিতে হইবে, কেননা অপরিসীম উপকরণ থাকার সম্ভাবনা নাই। এই যে চৌর্য্য, লাম্পট্য, দস্যুতা প্রভৃতি পাপ,—এ গুলি কি সন্তোষের ফল? না অসন্তোষের পরিণাম? নিশ্চয় অসন্তোষ হইতেই এই সকলের উৎপত্তি। সুতরাং সন্তোষই বাঞ্ছনীয়, অসন্তোষ নহে। তবে সন্তোষ হইতে আলস্য আসিয়া পড়ে—এ কথাও একেবারে ফেলিয়া দিবার উপায় নাই। তবে, এখন আমরা যেমন ‘পেট বড় ওস্তাদ’ বুঝিয়া, গৃহস্থালী-বদলে পাকস্থলীকে ওস্তাদিতে বাহাল রাখিয়াছি, তাহারই তাড়নায়, আলস্য ত্যাগ করিতেছি,—সেইরূপ পূর্ব্বমত যদি গৃহস্থালীকে আবার ওস্তাদিতে বসাইতে পারি,—যদি অতিথি-দেবতার পূজা, অবশ্য পোষ্যের পালন, পেট পূরণের মত প্রয়োজনীয় মনে করি, তাহা হইলে আমরা অলস হইবার অবসর পাইব না। পাঁচ জনকে দিয়া তবে পেট পুরাইতে হয়, এই ধারণা বদ্ধমূল থাকিলে আলস্য আর আমাদের উপর বল করিতে পারে না।

শ্রীবৃদ্ধি।

এখন আবার একবার সেই শ্রাদ্ধের প্রার্থনাবাক্য স্মরণ করুন। “আমার বংশে দাতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাউক...... দেয় বস্তুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাউক”। যে ঐকান্তিকতা সহকারে ঐরূপ প্রার্থনা আপনার পিতৃপুরুষদের কাছে করিতে পারে,

সে কি কখন আর অলস হইতে পারে? এখনকার দিনের বিজ্ঞেরা বলেন, "ষ্টাইল" (Style) না বাড়াইলে, উপার্জ্জন বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা হইবে কেন? সাংসারিক উন্নতি হইবে, কি প্রকারে? আমরা বিনীতভাবে সেই বিজ্ঞদিগকে জিজ্ঞাসা করি,—ঐ প্রার্থনায় কি ষ্টাইল বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা প্রকাশ পায় না? পায় বৈকি? তবে, আমাকে কোপ্তা-কাবাব, করি-কটলেট দাও—সে কথা নাই বটে। গাড়ী দাও, জুড়ি দাও, সে কথাও নাই বটে,—শাল দাও,রুমাল দাও, সে কথাও নাই বটে,—তবে আমার বংশে দেয় বস্তুর বৃদ্ধি পাউক, বংশে দাতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাউক—একি শ্রীবৃদ্ধির কথা নহে? যে যত পরের দুঃখ দূর করিতে পারে, তাকে আমরা তত শ্রীমান্ মনে করি। সেই শ্রী লাভ করিবার জন্য আমরা ব্যগ্র—আমরা কখন অলস হইতে পারি কি? আর যে আলস্যে ঋণ-বৃদ্ধি হয়,—সে আলস্য কি আমাদের আশ্রয় হইতে পারে? তাহা পারে না। আমরা যুধিষ্ঠিরের উপদেশ সম্যক প্রতি-পালনের চেষ্টাই করিয়া থাকি। আমরা বুঝি তাহাতেই সচ্ছন্দতা, সুখ, স্বস্তি এবং পারিবারিক শান্তি।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

স্বাস্থ্য ধর্ম্ম।

স্বাস্থ্য সকল ধর্ম্মের মূল। গৃহস্থ-ধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের সার। গৃহস্থ-ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইলে, স্বাস্থ্য অগ্রে আবশ্যক। শরীরের স্বাস্থ্য, মনের স্বাস্থ্য উভয়ই আবশ্যক। মনের স্বাস্থ্যের কথা ষোড়শ পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে। জড় জগতে শৃঙ্খলা না বুঝিলে, ভাব জগতের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি হয় না। এই শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্য না বুঝিলে, জগদীশ্বরের সৃষ্টির পরম মাঙ্গল্য দেখিতে পাওয়া যায় না, ধর্ম্মের ভাব উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। সুতরাং এই পরম মাঙ্গল্য না বুঝিলে, চিত্তে প্রফুল্লতা থাকে না। এই প্রফুল্লতাই মনের স্বাস্থ্যের লক্ষণ। শরীরে ও মনে বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; সাধারণত শরীর সচ্ছন্দ না হইলে মন প্রফুল্ল থাকে না। হৃদয়ে ধর্ম্মের ভাব পোষণ করিতে হইলে, শরীরের সচ্ছন্দতা একান্ত আবশ্যক। এই জন্য বলা হইয়াছে,—

"শারীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং।"

আমাদের বঙ্গদেশে শরীর সুস্থ রাখা একরূপ দায় হইয়া উঠিয়াছে। অনেক সময় আমরা আপন পায়ে আপনি কুঠারাঘাত করিতেছি। কতক সম্ভ্রমের খাতিরে, কতক বিলাসের বাসনায়, কতক নির্ব্বুদ্ধিতা হেতুক, কতক লোভে পড়িয়া এবং

কতক বা আলস্য নিবন্ধন, আমরা আমাদের আবাসভূমি নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর করিয়া তুলিয়াছি। আজি কালি রোগের তাড়নায় শরৎ-হেমন্ত—উভয় ঋতু আর বাঙ্গালায় বাস করা চলে না।

দোতলা কোঠা ঘরে বাস করা ভাল। কিন্তু যে দেশে ৪০৲। ৫০৲ টাকা মাসিক আয়ে গৃহস্থালী রক্ষা করিতে হয়, সে দেশে দোতলা বাড়ী প্রস্তুত করা অসাধ্য; পৈতৃক থাকিলে, বর্ষে বর্ষে নিয়মিত মেরামত করা অসম্ভব; অথচ মেটে ঘরে বাস অনেকেই করিতে পারেন। উচ্চ পোতার মেটে ঘর স্বাস্থ্যকর। কিন্তু তাহাতে আমাদের মন উঠে না। মেটে ঘরে এখন আর সম্ভ্রম রক্ষা হয় না। ইট-চূণ-কাঠের ঋণ করিয়া কোঠা ঘর প্রস্তুত করিতেই হইবে। মেঝে শুকাবার অবকাশ হয় না, সেঁতা ঘরে বাস করিয়া রোগে ভুগিয়া সম্ভ্রম রক্ষা করিতে হইবে। রুগ্ন-ভগ্ন ছেলে মেয়েদের জাল সাটিনের জামা জোড়া পরাইয়া আমরা সম্ভ্রম রক্ষার সঙ্গে বিলাস বাসনার তৃপ্তি সাধন করি। তাহার পর লোভের সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বুদ্ধিতা আছে,—গোপালনে অবহেলা করিয়া সদ্য সমানীত গব্য দুগ্ধের পরিবর্ত্তে এখন বিলাতী পচা মিল্ক্ জলে গুলিয়া ছেলেদের খাওয়াই। ফজ্‌লির আমের লোভে মালদহের জঙ্গল হইতে কলম আনাইয়া আপনার আঙ্গিনার রৌদ্র বায়ু বন্ধ করি। আর আমাদের আলস্য ত আমাদের সঙ্গের অনুচর অথচ মন্ত্রদাতা গুরু। উঠানের জল নিঃসরণ বন্ধ হইলে, একবার কোদাল

ধরিয়া নিকাশের পথটা পরিষ্কার করিয়া দিব,—তাহার উপায় নাই; আলস্য তাহাত কিছুতেই করিতে দিবে না; তাহার উপর অনর্থকর মিথ্যা সম্ভ্রম লৌহ যন্ত্র ছুঁইতেই দিবে না— "লজ্জা বলে, ছি! ছি ছুঁও না"। এইরূপে আমরা আপনার পদে আপনারা কুঠার মারিতেছি।

ভিজা মাটী, সেঁতা ঘর, চারি মাস জল ভরা উঠান, অর্থ লোভে পাট পচানি পরিপূরিত পঙ্কিল জল, ভিজা মাটীর বাষ্পে পরিপূর্ণ দূষিত বায়ু, বাসভূমিতে এবং চারিদিকে রৌদ্রাগম-বারিত নিবিড় জঙ্গল, তাহাতে পচানি-উদ্ভূত ভীষণ বিরাট-কায় মশক কীটের মেলা—এই সকলেতে পল্লীবাস নিতান্ত কষ্টকর করিয়া তুলিয়াছে। গৃহ নষ্ট করিয়া গৃহস্থালী খুঁজিলে আর কি হইবে? শরীর থাকে না, প্রাণে বাঁচা ভার, তা আমাদের ধর্ম্মরক্ষা কিরূপে হইবে? কিন্তু ধর্ম্মই ধর্ম্মকে রক্ষা করিবেন। স্বাস্থ্য-রক্ষা যে একটা ধর্ম্ম,—এই জ্ঞান জন্মিলেই সেই ধর্ম্ম রক্ষার প্রবৃত্তি হইবে।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

উপসংহার।

বড় আশায় এই গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছি। প্রথমেই বলিয়াছি, "এখনকার দিনে স্বধর্ম্ম যেন কিছু ম্রিয়মাণ বোধ হইতেছে; এভাব থাকিবে না, অচিরে স্বধর্ম্ম আবার জীবন্ত ভাবেই পরিদৃশ্যমান্ হইবে।" পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে বলিয়াছি, "নবযুগের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালি একটু একটু বুঝিতেছেন যে, ধর্ম্মে উপেক্ষা করিয়া আমরা কোন তত্ত্বই বুঝিব না, আমাদের কোন উন্নতিই হইবে না।" এটা কি সত্য কথা নহে? কেবল মাত্র কুহকিনী আশার একটা কুহক মাত্র কি? তাহাও বোধ হয় না।

তবে কি না, আশা থাকিলেই আশঙ্কা আসে। ব্রাহ্মণের দুর্দ্দশা দেখিয়া দশম অধ্যায়ের শেষে আশঙ্কায় আক্ষেপ করিয়াছি, "জানি না, ব্রাহ্মণের চক্ষু কবে উন্মীলিত হইবে। এমন করিয়া আর কত দিন চলিবে!" আশঙ্কার পর আবার আশা আছে, আক্ষেপের পর সান্ত্বনা আছে। একাদশের শেষে, য়ুরোপীয় লেখকের দোহাই দিয়া বলিয়াছি, "জাতিভেদ গত সংস্কারই ভারতবাসীকে রক্ষা করিয়াছে—আসূরীয়, মিশরীয়—যবন, রোমক—কোথায় অতলে চলিয়া গিয়াছে, ভারতবাসী আজিও দাঁড়াইয়া আছে।" কিন্তু সর্ব্বশ্রেণীর

মধ্যে অর্থলালসা দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ধর্ম্মের দিকে যেরূপ অবহেলা বাড়িতেছে, তাহাতে আবার আশঙ্কা হয় যে, ভারতবাসী বুঝি আর তিষ্ঠিতে পারিবে না ;—সেই জন্য দ্বাদশের শেষে বলিয়াছি—"ব্রাহ্মণ! নিরবচ্ছিন্ন অর্থ লালসাতেই তোমার অধঃপতন হইয়াছে। আবার ক্রমে ক্রমে সেই মায়া কাটাইয়া উঠ, আবার সেইরূপ আত্মবিস্তৃতি শিক্ষা কর, আবার সেইরূপ আধ্যাত্মিকতা জীবনের অবলম্বন কর, দেখিবে, তুমি আবার এই সকল সৃষ্টির ধর্ম্মত প্রভু হইবে।" ত্রয়োদশ-চতুর্দ্দশের মূল কথা—পৌরুষ দ্বারা কার্য্য সিদ্ধির চেষ্টা করিতে হয়।

এই পৌরুষের উপর দণ্ডায়মান হইয়া আমাদের ধর্ম্ম রক্ষার চেষ্টা করিতে হইবে। সনাতনীর শেষ কথা অগ্রে গ্রহণ করিতে হইবে। অগ্রে দেহ-মনের স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় করিতে হইবে। দেহের স্বাস্থ্য এখন অপেক্ষা একটু ভাল করিয়া রাখিতে না পারিলে, আমরা অতলে মিশাইয়া যাইব,—এই কথাটা বুঝিতে পারিলেই চেষ্টা আপনা হইতে আসিবে। কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা এখনকার দিনে বড় কঠিন ব্যাপার। বড় বিকৃত শিক্ষা দেশে চলিতেছে। একটা কুহকে, ভগবানের বিধানে, আমরা শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং আমাদের অনুকারিগণ, আমাদের দেখাদেখি বুঝিয়াছেন যে, এই সংসার দুঃখের ভাণ্ডার, আমরা প্রধানত দুঃখ ভোগ করিতেই জন্মিয়াছি। এটি বিষম ভুল ধারণা ; এই কুহক কাটাইয়া উঠিতে

না পারিলে আমাদের ধর্ম্ম, স্বাস্থ্য, সুখ—কিছুই হইবে না, কিছুই থাকিবে না। যদি ভগবানে কণামাত্র বিশ্বাস থাকে, তবে তাঁহার নিকট কাতরে প্রার্থনা কর, তিনি যেন নিজ কৃপায় ঐ মোহ ঘুচাইয়া দেন। আর যদি কিছু বিশ্বাস না থাকে, কাগজ-কলম লইয়া গণনা কর, দেখ কত খানি তোমার দুঃখ, আর কত খানি তোমার আনন্দ। গণনা করিলেই বুঝিতে পারিবে, তোমার দুঃখের অপেক্ষা তোমার সুখের কারণ অনন্ত গুণে অধিক।

আর একবার নিজ জীবনের কথা উপসংহারে বলিব—আমার আত্মম্ভরিতার অপরাধ লইবেন না।—একথা পূর্ব্বে 'পিতাপুত্রে' লিখিয়াছি,—এখানে প্রয়োজন বলিয়া আবার লিখিতেছি।

আমার যখন বিয়াল্লিশ বৎসর বয়স চলিতেছে, তখন দারুণ বিসূচিকা ব্যামোহে এক দিনের পীড়ায় হঠাৎ পিতার মৃত্যু হইল। আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম! "ক্রমেই আমার চক্ষে সমস্ত কুজ্‌ঝটিকাময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কুয়াসা অথচ ফাকা কুয়াসা—সমস্তই যেন ফাকা, আছে অথচ নাই। আমার কোন চিন্তাও নাই, ভাবনাও নাই। যেন আমি বলিয়াই একটা বোধ নাই। পত্নী ছেলেপিলেদের লইয়া ঘরের মধ্যে থাকেন,আমি একাকী বারান্দায় কম্বল-শয্যায় শয়ন করি। দ্বিতীয় রাত্রি এক ঘুমের পর চিন্তা আসিল, ভাবিতে লাগিলাম, 'দেখা যাউক, আমার

বয়সী বা আমার অপেক্ষা বয়সে বড়, আমাদের এখানে, এমন কয় জনের পিতা বর্ত্তমান আছেন।' দুই ঘণ্টা মনে মনে খতিয়ান্ করার পর দেখিলাম, এক জনের মাত্র আছেন—অন্নদা মুখোপাধ্যায়ের। ক্ষণেক চিন্তাহীন অবস্থায় আবার রহিলাম—আপনা আপনি কখন শ্বাস বন্ধ হইয়াছিল, চিন্তার সঙ্গে শ্বাস পড়িল। ভাবিলাম, 'তবে আমি "ভাগ্যহীন"—কিসে?' সকল সময়েই এইরূপ খতিয়ান্ করিলে, সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, বাস্তবিক আমরা ভাগ্যহীন নহি—সংসার দুঃখময় নয়। দুঃখ আছে বৈকি। দুঃখ না থাকিলে, পরম্ ধর্ম্ম যে সেবা, সে সেবা কাহাকে লইয়া চলিবে? আমরা যদি সেবাপরায়ণ হইয়া সেবার গৌরব বুঝিতে পারি, তাহা হইলে, সঙ্গে সঙ্গে বুঝিব, দুঃখ কিরূপ অকিঞ্চিৎকর।

এইরূপ করিয়া চিন্তা করিতে শিখিলে, মন প্রফুল্ল হইবে, হৃদয়ে ধর্ম্মভাব পরিপুষ্ট হইবে। ভিজা কাঠ হেটমুখ করিয়া কষ্টে একবার ধরাইতে পারিলে, সেই আগুণে কাঠও শুকায়,—আগুণও জ্বলে এবং তেজ ক্রমেই বাড়িতে থাকে; ধর্ম্মভাব হৃদয়ে একবার দেখা দিলে, সেই ধর্ম্মই ধর্ম্মকে রক্ষা করে, বর্দ্ধিত করে।

সমাপ্ত।
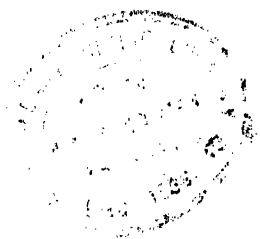
পরিশিষ্ট।

দীক্ষা।

("নবজীবন" হইতে উদ্ধৃত)।

দেবতা নির্ব্বাচনের নাম দীক্ষা। হিন্দু-দেবালয়ে নানা দেবতা নানা ভাবে বিরাজ করেন। একস্থলে কমল-লোচন, দয়াময়, পতিত-পাবন রামচন্দ্র ভার্য্যা ও অনুজগণে পরিবৃত হইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। অন্য স্থানে মদনমোহন, রাধারমণ, যশোদানন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মুরলি হস্তে ত্রিভঙ্গ ভাবে দণ্ডায়মান আছেন। এক স্থলে ধূর্জ্জটী ভস্ম-লেপিত অঙ্গে ধ্যানে নিমগ্ন। অন্য স্থলে ভগবতী দশভূজার মূর্ত্তিতে অসুর বিনাশ করিতেছেন। কোথাও বা সর্ব্বসংহারিণী কালী রক্তবীজের বিনাশ-সাধনে ব্যাপৃতা। সাধকের চক্ষে ইঁহারা সকলেই ঈশ্বর, সকলেই ঐশ্বরিক গুণে বিভূষিত। ইঁহাদের কেহ বা সাত্ত্বিক, কেহ বা রাজসিক, কেহ বা তামসিক গুণের অবতার। সাধক ইঁহাদের মধ্যে কাঁহাকে গ্রহণ করিয়া কাঁহাকে বর্জ্জন করিবেন? ইঁহাদের মধ্যে কাঁহার চরণে সাধক আপনাকে বিক্রীত করিবেন? এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য দীক্ষার ও দীক্ষা-গুরুর প্রয়োজন।

কেহ হয়ত ভাবিবেন যে, এইরূপ নির্ব্বাচনের প্রয়োজন কি? ইঁহারা সকলেই আমাদের আরাধ্য। আমরা সময়ে সময়ে ইঁহাদের সকলেরই আরাধনা করিব। শরতে দশভুজার পূজা করিয়া, শীতাগমে কালিকার পূজা করিব। বসন্তে মদনমোহনের সেবা করিয়া, নিদাঘে মহাদেবের আরাধনা করিব। যাঁহারা এইরূপ সার্ব্বদৈবিক পূজার পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকে আমরা বলিতে চাই যে, পূর্ব্বোক্ত পূজা সমস্ত নৈমিত্তিক পূজা। ঐ সমস্ত পূজায় দেবতাদিগকে আহ্বান করিয়া পুনরায় বিসর্জ্জন করিতে হয়। কিন্তু সেই দেবতা কে? —যাঁহাকে তুমি আবাহন করিয়া আর বিসর্জ্জন করিবে না? সেই দেবতা কে, যাঁহাকে তুমি তোমার হৃদয়-সিংহাসনের চির-অধীশ্বর করিয়া রাখিবে? সেই দেবতা কে, যাঁহাকে তুমি শয়নে-স্বপনে, আহারে-বিহারে, দুঃখে-সুখে, হর্ষে-বিষাদে, জীবনে মরণে অন্তরের অন্তরে উপভোগ করিবে? সেই দেবতা কে, যাঁহার প্রতি ধ্রুব লক্ষ্য রাখিয়া তুমি তোমার চিত্তের একাগ্রতা ও স্থিরতা সম্পাদন করিবে? এক স্ত্রীর বহু পতি হইলে যেমন প্রেমের ব্যাঘাত হয়, সেইরূপ এক আত্মার বহু ঈশ্বর হইলে ভক্তির ব্যাঘাত হয়। এই জন্য হিন্দুসাধক তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে এক জনকে পতিত্বে বরণ করিয়া তাঁহাতেই মনপ্রাণ সমর্পণ করেন। হিন্দুসাধক অন্য অন্য দেবতাকে অভক্তি বা অসম্মান করেন না। ঐ সমস্ত দেবতার মধ্যে, তিনি কাহাকেও বা পিতার ন্যায়, কাহা-

কেও বা মাতার ন্যায়, কাহাকেও বা ভ্রাতার ন্যায়, কাহাকেও বা ভগিনীর ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করেন। সময়ে সময়ে তিনি ইঁহাদিগকে কুটুম্বের ন্যায় হৃদয়মন্দিরে আনয়ন করেন এবং ইঁহাদিগের যথাবিধি অতিথি-সৎকার করেন। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে এক জনকে তিনি আত্মার অধীশ্বর করিয়া লইয়া তাঁহারই চরণে আপনাকে চিরদিনের জন্য বিক্রেয় করেন। এই অর্থে হিন্দুসাধক মাত্রকে একেশ্বরবাদী বলা অন্যায় বা অযৌক্তিক হয় না।

কিন্তু এই যে অনন্ত ঈশ্বরের অনন্ত মূর্ত্তি, ইঁহাদের মধ্যে কোনটিকে আমার আত্মার পতিত্বে বরণ করিব? এই যে তেত্রিশ কোটি দেবতা আমার সমক্ষে বিরাজ করিতেছেন, আমার চক্ষে ইঁহারা সকলেই সমান সুন্দর ও সমান প্রভাব-শালী। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে কাহার সহিত আমার আত্মার পরিণয়-কার্য্য সম্পাদন করিব? ইঁহাদের মধ্যে কে আমার আত্মার দারিদ্র্য দুর্গতি দূর করিবেন? ইঁহাদের মধ্যে কাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া আমার আত্মাদেবী ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত সুখের অধিকারিণী হইবেন? আমার আত্মাদেবী বড়ই কুরূপা, বড়ই দুঃশীলা। ইঁহাদের মধ্যে কে এমন দয়াময় আছেন যে, তিনি স্বর্গ-সিংহাসন বিস্মৃত হইয়া আমার জীর্ণ, কলুষিত হৃদয়-কুটীরের অধীশ্বর হইতে স্বীকার করিবেন?

যখন সাধকের আত্মা এইরূপে পরিণয়ের জন্য লালায়িত

হয়, তখন গুরু ঘটকের ন্যায় তাহার জন্য পাত্রান্বেষণ করেন। সাধারণ বিবাহে ঘটক যেরূপ বরকন্যার বংশমর্য্যাদা, জন্মনক্ষত্র, জন্মরাশি প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থির করেন, গুরুও সেইরূপ শিষ্য ও ঈশ্বর—এ উভয়ের নক্ষত্র, রাশি প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহাদের মধ্যে পরিণয়ের সম্বন্ধ স্থির করেন। হিন্দু সমাজে যে প্রণালীতে লৌকিক ও সাধারণ বিবাহ সম্পাদিত হইয়া থাকে, অবিকল সেই প্রণালীতেই পারত্রিক বিবাহও সম্পাদিত হইয়া থাকে। ঈশ্বর এই বিবাহের পরিণেতা, শিষ্যের আত্মা এই বিবাহের কন্যা এবং গুরু এই বিবাহের পুরোহিত বা ঘটক।

যে দিন আত্মার এই বিবাহ সম্পাদিত হয়, সে দিন কি সুখের দিন! শিষ্য প্রাতঃস্নান করিয়া, বস্ত্রালঙ্কারে সুশোভিত হইয়া, শুদ্ধদেহে, শুদ্ধান্তঃকরণে গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। গুরুও সাদরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিতেছেন,—“বৎস! তুমি বড় সৌভাগ্যশালী। তোমার আত্মার বড় সুন্দর পাত্র মিলিয়াছে। আহা পাত্রের কি অনির্ব্বচনীয় রূপ! কি অনির্ব্বচনীয় গুণ! তোমার আত্মার সহিত এই পাত্রের রাজযোটক গণনা হইয়াছে। তোমার আত্মা চিরসুখী হইবে।” শিষ্য আনন্দে উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া গুরুর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছেন। কে তাঁহার আত্মার পাত্র শুনিবার জন্য তাঁহার ঔৎসুক্য ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতেছে। এমন সময়ে গুরু তাঁহার কর্ণে কর্ণে সেই পাত্রের নাম, গুণ, মহিমা বলিয়া

দিলেন। তাঁহার আত্মার পাত্র মিলিল। সম্মুখস্থ দেবালয়ে শিষ্য তাঁহার পাত্রের রূপ-গুণ সমস্ত অবলোকন করিলেন। আনন্দে, প্রেমে, উৎসাহে তাঁহার হৃদয় পূরিয়া গেল। ভক্তি-ভাবে তাঁহার আত্মার পতিকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"স্বামিন্, আজি হইতে তুমি আমার প্রাণেশ্বর।" এবং তৎ-পরেই তিনি শুনিলেন, যেন দেবতা বলিতেছেন,—"বৎস! আজি হইতে আমি তোমার আত্মাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিলাম।" যৎকালে উভয়ের মধ্যে এইরূপ গ্রন্থিবন্ধন হইতেছে, তৎকালেই পরিজনেরা শঙ্খ-ঘণ্টার নাদে দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত করিতেছে, তৎকালেই বিবাহসূচক উলুধ্বনিতে জগৎ পরিব্যাপ্ত হইতেছে, তৎকালেই চতুর্দ্দিকে আনন্দের কোলাহল বিকীর্ণ হইতেছে। যে দেশে প্রতি গৃহে নরনারী এইরূপ পারত্রিক পরিণয়ে পরিণীত হইতেছে, সে দেশ ধন্য! এবং যাঁহাদের আত্মা এইরূপ বিবাহে মনোমত ঈশ্বর লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহারাও ধন্য!

এক্ষণে আমাদের শাস্ত্রে, দীক্ষা, গুরু, শিষ্য, মন্ত্র প্রভৃতির কিরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

১ম। দীক্ষা—যে ক্রিয়া জ্ঞান দান করে ও পাপ ক্ষয় করে, তাহার নাম দীক্ষা।—

"দীয়তে জ্ঞানমত্যন্তং ক্ষীয়তে পাপসঞ্চয়ঃ।
তেন দীক্ষেতি সা জ্ঞেয়া পাপচ্ছেদক্ষমা ক্রিয়া॥"

রঘুনন্দন কৃত প্রয়োগসার।

২য়। দীক্ষার কালাকাল বিচার। দীক্ষাকার্য্যে শুভ দিন শুভ ক্ষণ নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। কিন্তু না করিলেও প্রত্যবায় নাই। যথা—

"যদৈবেচ্ছা তদা দীক্ষা গুরোরাজ্ঞানুরূপতঃ।
ন তিথির্ন ব্রতং হোমো ন স্নানং ন জপক্রিয়া।
দীক্ষায়াং কারণং কিন্তু স্বেচ্ছাবাপ্তে তু সদ্‌গুরৌ॥"

অর্থাৎ যদি সদ্‌গুরু স্বেচ্ছায় উপস্থিত হন এবং যদি তাঁহার অনুমতি থাকে, তাহা হইলে তিথি, ব্রত, হোম, স্নান, জপ প্রভৃতি সমস্ত উপেক্ষা করিয়া, সকল সময়েই মন্ত্র গ্রহণ করা যাইতে পারে।

৩য়। গুরু।

গুরু—বেদ, দর্শন প্রভৃতি সকল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইবেন। পরোপকারই তাঁহার ব্রত হইবে এবং তিনি জপপূজাদি কার্য্যে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিবেন।

"সর্ব্বাগমানাং সারজ্ঞঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ।
পরোপকার নীরতো জপপূজাদি তৎপরঃ॥
ইত্যাদি গুণসম্পন্নো গুরুরাগম পারগঃ।"

শৈবপুরাণে গুরুর মহিমা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে,—

"যো গুরুঃ স শিবঃ প্রোক্তো যঃ শিবঃ স চ শঙ্করঃ।
শিববিদ্যা গুরুণাঞ্চ ভেদোনাস্তি কথঞ্চন॥"

অর্থাৎ যিনি গুরু, তিনিই শিব। যিনি শিব তিনিই শঙ্কর। শিব, গুরু ও গুরুদত্ত বিদ্যা—এ তিনের মধ্যে কোনরূপ প্রভেদ নাই।

কিন্তু গুরু যদি অনুপযুক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে।

"গুরোরবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য:পরিত্যাগো বিধীয়তে॥" মহাভারত।

গুরু যদি অসৎ কার্য্যে লিপ্ত থাকেন, তাঁহার যদি কার্য্যাকার্য্য বিবেচনা না থাকে এবং তিনি যদি অসৎ পথের পথিক হন, তাহা হইলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করা উচিত।

৪র্থ। শিষ্য।

"বাঙ্মনঃ কায়বস্তুভিঃ গুরুশুশ্রূষণে রতঃ।
এতাদৃশ গুণোপেতঃ শিষ্যো ভবতি নাপরঃ॥
দেবতাচার্য্য শুশ্রূষাং মনোবাক্‌কায়কর্ম্মভিঃ।
শুদ্ধভাবো মহোৎসাহো বোদ্ধা শিষ্য ইতি স্মৃতঃ॥"

যিনি কায়মনোবাক্যে ও ধন দ্বারা দেবতা, আচার্য্য ও গুরুর শুশ্রূষা করেন, যিনি নির্ম্মলচিত্ত, যিনি শ্রমশীল এবং যিনি বুদ্ধিমান্ তিনিই শিষ্য নামে কথিত হইবার উপযুক্ত।

৫ম। মন্ত্র।

যাহা দ্বারা বিশ্বজ্ঞান লাভ করা যায় এবং যাহা দ্বারা সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তাহার নাম মন্ত্র। যথা—

"মননং বিশ্ববিজ্ঞানং ত্রাণং সংসারবন্ধনাৎ।
যতঃ করোতি সংসিদ্ধ্যৈ মন্ত্র ইত্যভিধীয়তে॥"

একটি মন্ত্র সম্যক্‌রূপে সাধনা করিলেও শুদ্ধ হওয়া যায়। যথা—

"সম্যক্ সিদ্ধৈকমন্ত্রস্ত নাসিদ্ধমিহকিঞ্চন।
বহুমন্ত্রবতঃ পুংসঃ কা কথা হরিরেব সঃ॥"

মন্ত্র গ্রহণ শেষ হইলে, শিষ্য গুরুকে এই বলিয়া প্রণাম করিবে—

"ত্বৎপ্রসাদাদহং দেবঃ কৃতকৃত্যোঽস্মি সর্ব্বতঃ।
মায়ামৃত্যু মহাপাশাৎ বিমুক্তোঽস্মি শিবোঽস্মি চ॥"

হে গুরো! আজি আমি আপনার প্রসাদে সর্ব্ব প্রকার কৃতার্থতা লাভ করিলাম। আমি মায়াপাশ ও মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া শিবত্ব লাভ করিলাম।

অন্য অন্য জাতির মধ্যেও এই দীক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত আছে। কিন্তু দীক্ষার দিনে তাঁহারা ঈশ্বরের সহিত দাস্যভাব সংস্থাপন করেন। তাঁহারা ঈশ্বরের সহিত কান্তভাব সংস্থাপন করিতে সাহসী হন না। সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের চরণে আপনাকে বিক্রয় করিতে হইবে, এ ভাব হিন্দুজাতি ভিন্ন আর কেহই প্রাপ্ত হন নাই। ঈশ্বরকে "স্বামিন্" বলিয়া সম্ভাষণ করিতে আর কাহারও সাহস হয় নাই।
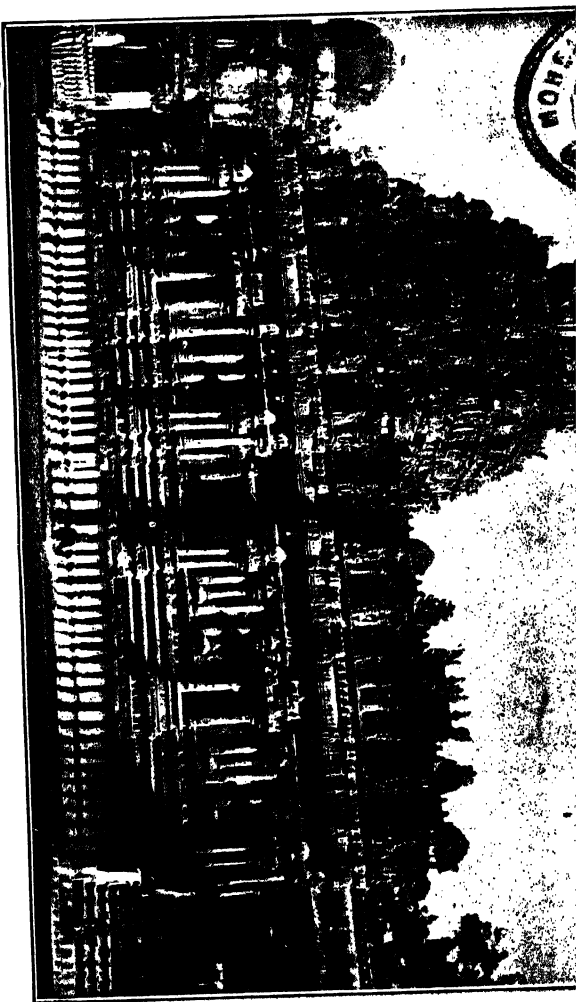
Photo. by Bourne and Shepherd, Calcutta.

Sabrahmanya Temple, Tanjore.